

আজিক আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জেনে রাখ, যদি উম্মতের সবাই তোমার কোন উপকার করতে একত্রিত হয়, তারা তোমার কোনই উপকার করতে পারবে না, ততটুকু ব্যতীত যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে ইচ্ছা করে, তবে শুধু ততটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন' (তিরমিযী হা/২৫১৬)।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

৩০তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০২৬

ডেঙ্গু মহামারী

ঈমান ও মানবিক দায়িত্ব



প্রকাশক : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০



"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
المجلد ٣٠: العدد ١ ربيع الآخر وجمادى الأولى ١٤٤٨هـ / أكتوبر ٢٠٢٦
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤন্ডেশن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

নার্সারী শ্রেণীর ৫টি বই



শিশু শ্রেণীর ৫টি বই



প্রথম শ্রেণীর ৮টি বই সমূহ



দ্বিতীয় শ্রেণীর ৯টি বই



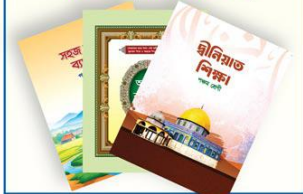
তৃতীয় শ্রেণীর ১০টি বই



চতুর্থ শ্রেণীর ১২টি বই



পঞ্চম শ্রেণীর ৫টি বই



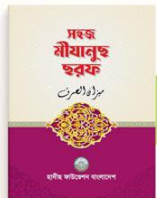
অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ



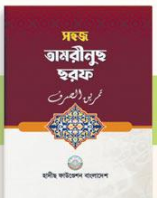
বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুঙ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বিনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

আরবী ব্যাকরণ বিষয়ক ৪টি বই



মীযানুছ হুরফ



তামরীনুছ হুরফ



তাকমীলুছ হুরফ



আমীনুন নাহ



হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮০৫-৯৫৮৮২২।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০ | hadeethfoundationbd.com

ISSN : 3105-4137

আত-তাহরীক

রেজি: নং রাজ ১৬৪

"التحریر" مجلة علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৩০তম বর্ষ

১ম সংখ্যা

রবীঃ আখের-জুমাঃ উলা ১৪৪৮ হি.
আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩৩ বাং
অক্টোবর ২০২৬ খৃ.

। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

। সম্পাদক

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

। সহকারী সম্পাদক

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া
(আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
একাউন্ট নং : Masik At-Tahreek, 00712200
00115, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।

- ◆ সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- ◆ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- ◆ হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- ◆ হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- ◆ হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- ◆ তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ◆ ফৎওয়া ইটলাইন : ০১৮০৫-৪৫৬৩৪৮

(সকাল ৯-টা থেকে ১-টা এবং বিকাল ৪-টা থেকে ৬-টা পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩

ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

ওয়েবসাইট : www.ahlehadethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ	৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/- ২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/- ২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/- ৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/- ৩৫০০/-

সূচীপত্র

◆ সম্পাদকীয় :

► সর্ব্ব্বাসী দুর্নীতি ও বেপারোয়া দলীয়করণে বিপন্ন দেশের ভবিষ্যত ০২

◆ অহির আলো :

► অহি-র গুরুত্ব ও তাৎপর্য -আত-তাহরীক ডেস্ক ০৩

◆ প্রবন্ধ :

► ডারউইনবাদ : বিজ্ঞানের আড়ালে নাস্তিকতার রাজনীতি
(২য় কিস্তি) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাকিব ০৪

► হাদীছ অনুযায়ী আমল (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ০৭

-মূল (ফার্সী) : মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

► উইঘুর মুসলিম নির্বাতন ও মানবাধিকার সংকট : একটি ১০

ঐতিহাসিক ও সমকালীন বিশ্লেষণ -ড. মোহাম্মাদ আজিবার রহমান

► নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা : পরকালীন জীবনের অনন্য ১৭

পাথের -আব্দুল্লাহ আল-মারুফ

► যুগে যুগে শী'আদের অপতৎপরতা -মুজাহিদুল ইসলাম ২২

► জবাবদিহিতা : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের অন্যতম ২৬

ভিত্তি (পূর্ব প্রকাশিতের পর) -মামুন বিন হাশমত

◆ প্রচ্ছদ রচনা :

► ডেঙ্গু মহামারী : ঈমান ও মানবিক দায়িত্ব ২৮

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

◆ সন্তান পরিচর্যা :

► আদর্শ সন্তান গঠনে পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা এবং ৩১

উত্তরণের উপায় -মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম

◆ আত্মচিন্তা :

► আমার বয়স হয়েছে -সারওয়ার মিহবাহ ৩৫

◆ দো'আ ও যিকর :

► বিপদে মুমিনের সেরা হাতিয়ার -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজী ৩৭

◆ ইতিহাসের পাতা থেকে :

► ন্যায়বিচারের মূর্তপ্রতীক কাযী শুরাইহ (রহঃ) ৩৮

-ড. নূরুল ইসলাম

◆ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :

► ক্বারী ছাহেবের সংবিধান -সারওয়ার মিহবাহ ৩৯

◆ স্বদেশ-বিদেশ

৪৪

◆ মুসলিম জাহান,

৪৫

◆ বিজ্ঞান ও বিস্ময়

৪৫

◆ সংগঠন সংবাদ

৪৬

◆ প্রশ্নোত্তর

৪৯

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সর্বশ্রাসী দুর্নীতি ও বেপরোয়া দলীয়করণে বিপন্ন দেশের ভবিষ্যৎ

জুলাই গণ অভ্যুত্থানের পর সবার কাম্য ছিল কমপক্ষে একটি বৈষম্যহীন, মেধাভিত্তিক ও জবাবদিহিতামূলক রাষ্ট্রকাঠামোর। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সীমিত সক্ষমতার মধ্যেও সে পথে কিছুটা এগিয়েছিলেন। কিন্তু গত ১২ই ফেব্রুয়ারীতে গণতান্ত্রিক দলীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর যথারীতি ফেলে আসা দলীয়করণ পুনরায় বিপুল বিক্রমে ফিরে এসেছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভিসি-রেজিস্ট্রার নিয়োগ থেকে শুরু করে সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, সরকারী নিয়োগ পরীক্ষা ইত্যাদি হেন কেন জায়গা নেই, যেখানে যোগ্যতার বদলে দলীয় পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। যা জুলাই পরবর্তী জাতির ইচ্ছা-আকাংখাকে গলা টিপে হত্যা করা ও জাতির ভবিষ্যৎ মেধা-সম্পদকে ধ্বংস করার এক নীরব প্রক্রিয়া মাত্র।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) প্রকাশিত সর্বশেষ দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) ২০২৫-এ ১৮২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর হয়েছে ১০০-তে ২৪, যা বিশ্বের সর্বনিম্ন স্কোরগুলোর একটি এবং দক্ষিণ এশিয়ায় আফগানিস্তানের পর সর্বনিম্ন। সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক মন্তব্য করেছেন যে, জুলাই অভ্যুত্থান-উত্তর সংস্কার প্রক্রিয়ার দুর্বলতা এবং মাঠপর্যায়ে দুর্নীতি অব্যাহত থাকায় সামগ্রিক অবস্থানের অবনতি ঘটেছে। ফলে একটি বড় সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। অর্থাৎ অভ্যুত্থানের পর যে সংস্কারের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, বাস্তবে হয়েছে তার বিপরীত।

সম্প্রতি নিয়োগ পরীক্ষার ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত সিদ্ধান্তে একই দ্বিচারিতা লক্ষণীয়। শীর্ষ পর্যায়ের বিসিএস পরীক্ষায় স্বচ্ছতার দাবিতে ভাইভার নম্বর কমানো হলেও, ১১ থেকে ২০ গ্রেডের বিপুলসংখ্যক পদে ঠিক উল্টো পথে হাঁটা হচ্ছে। প্রস্তাবিত বিধিমালা অনুযায়ী, এসব গ্রেডে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ৪০০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো এবং লিখিত পরীক্ষায় পাসের ন্যূনতম নম্বর ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায় যে, এই পরিবর্তন নিয়োগ-বাণিজ্যকে আরও সহজলভ্য করারই মাধ্যম। প্রশ্ন হচ্ছে, যে জুলাইয়ের সূচনাই হয়েছিল মেধার বৈষম্য দূর করার জন্য, সেই বৈষম্য পুনরায় ফিরে আসতে চলেছে অতীতের চেয়ে আরো নগ্ন চেহারায়!

শুধু নিয়োগ ও পদায়নে দলীয়করণেই সংকট সীমাবদ্ধ নয়; সরকারের অনেক নীতিগত সিদ্ধান্তও প্রায় নীরবে নেওয়া হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে আত্মঘাতী প্রমাণিত হতে পারে। আইন-শৃংখলার ক্রমাবনতি যখন সকলকে উদ্ভিগ্ন করে তুলেছে, ঠিক তখনই তেলের মূল্য আরো একদফা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা মে মাসের মূল্যবৃদ্ধির পর ২য় দফা বৃদ্ধি। অথচ আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমে গেছে। একইভাবে, ২০২৭ সালের দাখিল ও এসএসসি পরীক্ষায় সাধারণ ও মাদ্রাসা বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে। যার বিরুদ্ধে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে বহু আপত্তি উঠেছে। এর ফলে বিগত সরকারের মত মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব কমানোর মিশনই অব্যাহত রাখা হবে।

সরকার সম্প্রতি নবম জাতীয় বেতনস্কেল অনুমোদন করেছে। যেখানে বিভিন্ন গ্রেডে মূল বেতন সর্বোচ্চ ১৪২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ছে। এটির বাস্তবায়নে সরকারের অতিরিক্ত বার্ষিক ব্যয় হবে প্রায় এক লাখ পাঁচ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা। এতে প্রায় সাড়ে চৌদ্দ লাখ সরকারি কর্মচারীদের খুশী করা গেলেও বাজারে সবকিছুর দাম বাড়বে। ফলে মুদ্রাস্ফীতির চাপে পুরো দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বিশৃংখল হয়ে পড়বে। একই সময়ে মেগা প্রকল্পগুলোতে ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতাও বাড়ছে। টাকার নতুন মেট্রোরেল লাইন এমআরটি-৫ (উত্তর)-এর ব্যয় ৪১ হাজার ২৩৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৯ হাজার ৮৪৮ কোটি টাকায়। যা ভবিষ্যতে দুর্নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে।

ইসলাম আমানতদারিতা ও ন্যায়বিচারকে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক ভিত্তি হিসাবে নির্ধারণ করেছে (নিসা ৪/৫৮)। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন অযোগ্য ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে, তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা কর (বুখারী হা/৬৪৯৬; মিশকাত হা/৫৪৩৯)। তিনি সতর্ক করেছেন যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলি ধ্বংস হয়েছিল এ কারণে যে, তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অপরাধ করলে ছাড়া পেত এবং দুর্বল ব্যক্তি অপরাধ করলে শাস্তি পেত (বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬১০)। এই নীতি-নৈতিকতার অভাবই আজকের রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যর্থতার পিছনে মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা সরকারের প্রতি জোরালো আহ্বান জানাই, জনগণের আমানত নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলা নয়, জুলাইপূর্ব অভিজ্ঞতাকে মাথায় রেখে এবার একটি আদর্শ দেশ গড়ার শপথ নিন। এক্ষণে দেশকে দুর্নীতি ও অনাচারের শীর্ষস্থান থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের প্রস্তাব সমূহ নিম্নরূপ : (১) সর্বত্র দলীয়করণ বন্ধ করতে হবে। বিশেষ করে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে হবে। (২) সর্বস্তরে মেধাভিত্তিক নিয়োগ, নিরপেক্ষ প্রশাসন ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি চালু করতে হবে। (৩) বাজার অর্থনীতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারী কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করতে হবে। (৪) মেগা প্রকল্পের নামে মেগা দুর্নীতির পথ বন্ধ করতে হবে। (৫) জনজীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করে এমন প্রতিটি সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে নিতে হবে। নিছক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নয়। (৬) সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার সমন্বয়ের নামে মাদ্রাসা শিক্ষাকে গুরুত্বহীন ও অকার্যকর করার নীতি বন্ধ করতে হবে।

সর্বোপরি রাষ্ট্রক্ষমতায় যারাই থাকুক না কেন, প্রকৃত জবাবদিহিতা, আমানতদারিতা ও মেধাভিত্তিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া কোন সংস্কারই টেকসই হবে না। আল্লাহ আমাদের দেশ পরিচালনায় নিয়োজিত সকলকে ন্যায়বিচার ও সততার সাথে দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিন এবং দেশকে দুর্নীতির অভিশাপ থেকে হেফাযত করুন-আমীন! (স.স.)।

অহি-র গুরুত্ব ও তাৎপর্য

-আত-তাহরীক ডেস্ক

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ - يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

‘নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হ’তে এসেছে একটি নূর ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাব। যার মাধ্যমে আল্লাহ এসব লোকদের শান্তির পথ সমূহ প্রদর্শন করেন, যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তিনি তাদেরকে (কুফরীর) অন্ধকার হ’তে (ঈমানের) আলোর দিকে বের করে আনেন স্বীয় অনুমতিক্রমে। আর তিনি তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন’ (মায়দাহ ৫/১৫-১৬)।

ব্যাখ্যা :

ক. ‘নূর’ ও ‘স্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাব’-এর তাৎপর্য : হাফেয ইবনু কাছীর (রহ.) তাঁর বিখ্যাত তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, আয়াতে ‘নূর’ ও ‘কিতাব’ দ্বারা প্রধানত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং এটি যার ওপর নাযিল হয়েছে সেই রাসূল (ছাঃ)-কে বোঝানো হয়েছে (তাকসীর ইবনু কাছীর, ৩/৫৫ পৃ.)।

ইমাম ইবনু জারীর ত্বাবারী ও আল্লামা শাওকানী (রহ.) উল্লেখ করেছেন, আয়াতে ‘নূর’ ও ‘সুস্পষ্ট কিতাব’ দ্বারা মূলতঃ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকেই বোঝানো হয়েছে। এখানে গুণবাচক অর্থে একটি সত্তাকে দু’টি অভিধায় (নূর ও কিতাব) ভূষিত করা হয়েছে (عُطِفُ الصِّفَةِ عَلَى الصِّفَةِ)। কারণ কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী এবং অন্তরের অন্ধকার দূরকারী নূর (তাকসীর ত্বাবারী, ১০/১৪৪-১৪৫ পৃ.: ফাতহুল ক্বাদীর, ২/৩০ পৃ.)।

খ. অন্ধকার থেকে আলোর দিকে উত্তরণ : ইমাম ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহ.) এবং আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, আয়াতে বহুবচন ‘যুলুমাত’ (অন্ধকারসমূহ) দ্বারা কুফর, শিরক, বিদ‘আত, নিফাক ও নফসের আনুগত্যের শতধা বিভক্ত পথকে বোঝানো হয়েছে। আর একবচন ‘নূর’ (আলো) দ্বারা তাওহীদ, সুন্নাহ এবং সরল-সঠিক একটিমাত্র পথকে বোঝানো হয়েছে (তাকসীর ত্বাবারী, ১০/১৪৪-১৪৫ পৃ.: মাদারিজুস সালিকীন, ১/৩১২ পৃ.)।

গ. শান্তির পথ (সুবুলুস সালাম) : আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী হয়, আল্লাহ তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সালাম তথা নিরাপত্তার পথ সুগম করে দেন (তাকসীর কুরতুবী, ৬/১১৮-১১৯ পৃ.)।

একটি সংশয় ও তার নিরসন :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি ‘নূরের’ তৈরী? অনেকে উক্ত আয়াতে বর্ণিত ‘নূর’ শব্দ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) শারীরিক বা সৃষ্টিগতভাবে ‘নূরের তৈরী’ বলে প্রমাণ করতে চান, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অহি-ভিত্তিক আকীদা পরিপন্থী। এর কারণ হ’ল—

প্রথমত : আয়াতে ‘নূর’ শব্দটি মাজাবী (রূপক) বা হেদায়াতের অর্থে ব্যবহার হয়েছে, শারীরিক উপাদান (মাদ্দা) অর্থে নয়।

আল-কুরআনে কুরআনকেও ‘নূর’ বলা হয়েছে (আরাফ ৭/১৫৭), তাওরাতকেও ‘নূর’ বলা হয়েছে (মায়দাহ ৫/৪৪)। সুতরাং ‘নূর’ বললেই বস্তুগত আলো বা নূরের সৃষ্টি বোঝায় না।

দ্বিতীয়ত : রাসূল (ছাঃ)-এর মানবীয় সত্তা (বাশারিইয়াত)। কুরআন মাজীদের অগণিত আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) সৃষ্টিগতভাবে একজন মানুষ (বাশার)। আল্লাহ বলেন, ‘বলুন! আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহি নাযিল হয়’ (কাহফ ১৮/১১০)। অর্থাৎ তিনি মানুষের মতই জন্মগ্রহণ করেছেন, পিতা-মাতার সন্তান ছিলেন এবং স্বাভাবিক মানুষের মত তাঁরও দৈহিক প্রয়োজন ছিল ও তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

তৃতীয়ত : রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নূর (আলো) থেকে, জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের শিখা থেকে এবং আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে, যার বিবরণ তোমাদের দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ মাটি থেকে)’ (মুসলিম হা/২৯৯৬)। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেহেতু আদম (আঃ)-এর বংশধর, তাই তিনি সৃষ্টিগতভাবে মাটির তৈরী মানবসন্তান, ফেরেশতাদের মত নূরের তৈরী নন।

চতুর্থত : রাসূল (ছাঃ) নিশ্চয়ই ‘নূর’ বা আলো, তবে তা হেদায়াত ও নবুঅতের নূর, সৃষ্টিগত উপাদান নয়। তাঁর মাধ্যমে পুরো পৃথিবী জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে হেদায়াতের আলো লাভ করেছে। সুতরাং তাঁকে সত্তাগতভাবে ‘নূর’ বলার কোন দলীল নেই। বরং তিনি আমাদের মতই মানুষ ছিলেন।

শিক্ষা :

১. অহি-র বিধানের প্রয়োজনীয়তা : মানব রচিত কোন চিন্তাধারা বা দর্শন মানুষকে হেদায়াত দিতে পারে না। কেবল অহী ভিত্তিক জ্ঞানই মানুষকে যাবতীয় পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত রাখতে পারে।

২. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কামনাই হেদায়াত লাভের শর্ত : অহি-র আলো থেকে উপকৃত হ’তে হ’লে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আন্তরিক ইচ্ছা (إِتْبَاعُ الرِّضْوَانِ) থাকা আবশ্যিক। নতুবা অহি-র আলো থেকে পূর্ণাঙ্গ ফায়দা লাভ করা সম্ভব নয়।

৩. শিরক ও বিদ‘আত থেকে মুক্ত থাকা : অহি তথা একমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণই সমাজকে শিরক, বিদ‘আত ও অন্ধ তাকলীদ থেকে বের করে তাওহীদ ও সুন্নাহর আলোকোজ্জ্বল পথে পরিচালিত করতে পারে।

৪. ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রকৃত শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অহি-র বিধানের অনুসরণ ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

৫. সুন্নাহর আনুগত্য : রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হিসাবে বিশ্বাস করে তাঁর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের মাধ্যমেই কেবল ‘সুবুলুস সালাম’ বা শান্তির পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত আয়াতের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করার এবং আল্লাহ প্রেরিত নূর তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গঠনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

ডারউইনবাদ : বিজ্ঞানের আড়ালে নাস্তিকতার রাজনীতি

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাকিম

(২য় কিস্তি)

পূর্বোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, বিবর্তন ঘটানোর কোন ক্ষমতাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের নেই। অথচ ডারউইন ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ (Natural Selection)-কেই বিবর্তনের প্রধান চালিকাশক্তি বানিয়েছিলেন। যদিও তিনি নিজেও এ সত্যটি অবগত ছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন যে, Unless profitable variations occur, natural selection can do nothing (প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুকূল বৈষম্য কিংবা বৈচিত্র্য না ঘটা পর্যন্ত প্রাকৃতিক নির্বাচন কিছুই করতে পারে না)।^১

এই ‘অনুকূল পরিবর্তনগুলো’ কিভাবে ঘটে, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ডারউইনের জানা ছিল না। ফলে তিনি তার যুগের ফরাসি জীববিজ্ঞানী জাঁ-ব্যাপটিস্ট ল্যামার্কের ‘অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমিক স্থানান্তর’ (Lamarckism) তথা বংশীয় ক্রমবিকাশের ধারণার ওপর নির্ভর করেছিলেন। যেমন, ল্যামার্কের মতে, জিরাফের পূর্বপুরুষেরা উঁচু গাছের পাতা খাওয়ার আশ্রয় চেষ্টা চালাতে গিয়ে ঘাড় কিছুটা প্রসারিত করেছিল, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়ে আজকের লম্বা ঘাড়ের জিরাফে পরিণত হয়েছে। ডারউইন নিজেও একই ল্যামার্কীয় ধারায় দাবী করেছিলেন যে, খাবারের খোঁজে মুখে হাঁ করে পানিতে সাঁতার কাটতে থাকা কিছু ভালুক কালের পরিক্রমায় তিমিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।^২ এই অবাস্তব হাস্যকর গল্পগুলো পরবর্তীতে গ্রেগর ম্যাডেলের জিনতত্ত্ব/বংশগতি সূত্র (Genetics) আবিষ্কৃত হওয়ার পর সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হয়েছে।^৩ অধিকন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ১৯৫৩ সালে ডিএনএ (DNA)-র গঠন এবং আণবিক জীববিজ্ঞানের ‘সেন্ট্রাল ডগমা’ (Central Dogma) আবিষ্কৃত হওয়ার পর জানা যায় যে, প্রতিটি জীবকোষের নিউক্লিয়াসে সুনির্দিষ্ট জৈবিক তথ্য বা সংকেত (Genetic Code) সংরক্ষিত থাকে। ফলে কোন জীবদেহের জীবনকালে অর্জিত কোন শারীরিক পরিবর্তন বা চর্চা সন্তানের ডিএনএ-তে পৌঁছায় না।^৪

সুতরাং আধুনিক বংশগতি বিদ্যা ও আণবিক জীববিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুযায়ী প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কোন জৈবিক তথ্য (Genetic Code) বা সম্পূর্ণ নতুন কোন অঙ্গের উদ্ভাবন ঘটানো অসম্ভব। ফলে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে বিবর্তনের প্রধান চালিকাশক্তি বানিয়ে এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরের দাবিটি বৈজ্ঞানিকভাবেই সম্পূর্ণ অসার প্রমাণিত হয়।

২. সাধারণ পূর্বপুরুষ তত্ত্ব পর্যালোচনা :

ডারউইনের অন্যতম দাবী হ’ল, পৃথিবীর সকল জীব সেটা হোক এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকে সুবিশাল নীলতিমি, কিংবা ক্ষুদ্র ছত্রাক থেকে জটিল মানবজাতি, সবকিছু একটিমাত্র আদি প্রাণ থেকে বিবর্তিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি কোটি কোটি বছর ধরে অতি ধীর গতিতে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তনের সঞ্চয়ের মাধ্যমে ঘটে চলেছে। ডারউইনের ভাষায় এটিই ছিল one long argument (এক সুদীর্ঘ যুক্তি), যেখানে জীবজগতের বৈচিত্র্যকে একটি বিশাল জীবন-বৃক্ষের (Tree of Life) মূল কাণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখায় বিভূতির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

অথচ গত ১৬৫ বছরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এই একক পূর্বপুরুষ মতবাদের পক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং এর অসম্ভবতাই প্রমাণিত হয়েছে। যা নিম্নরূপ-
প্রথমত ফসিল বা জীবাশ্ম রেকর্ডের শূন্যতা : এক-কোষ বিশিষ্ট জীবদেহ যদি ক্রমবিকাশের মাধ্যমে মানুষের মত অতি উচ্চ ধরনের প্রাণীতে পরিণত হয়, তবে তার কোন প্রাচীন ফসিল বা জীবাশ্ম রেকর্ড নিশ্চয়ই থাকতে হবে, যা ক্রমবিকাশের (Gradualism) প্রমাণ বহন করে! অথচ বাস্তবতা হ’ল এই যে, আজ থেকে প্রায় ৫৪ কোটি বছর আগে মাত্র ১-২ কোটি বছরের মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ প্রধান প্রাণীদলের জীবাশ্ম (যেমন: পতঙ্গ, শামুক, মেরুদণ্ডী প্রাণীর পূর্বসূরী) রেকর্ড হঠাৎ করেই একসাথে পাওয়া গেছে (যাকে আখ্যা দেয়া হয়েছে ‘ক্যামব্রিয়ান তথ্য-বিস্ফোরণ’ (Cambrian Information Explosion)। কিন্তু এদের আগের কোন পূর্বপুরুষের জীবাশ্ম রেকর্ড পাওয়া যায় না।^৫ ডারউইন নিজেই স্বীকার করেছেন যে, হঠাৎ করে এত রকমের প্রাণীর আবির্ভাব তার তত্ত্বের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যুক্তিগুলোর একটি, যার কোন উত্তর তার কাছে নেই।^৬ ডারউইন ধারণা করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে হয়তো মাটির নিচে এসব প্রাক-ক্যামব্রিয়ান পূর্বপুরুষদের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হবে। কিন্তু বিগত দীর্ঘ ১৬৫ বছর ধরে বিশ্বজুড়ে মাটির নিচে শিলান্তরে কোটি কোটি জীবাশ্ম সংগৃহীত হওয়ার পরেও ধারাবাহিকভাবে অনুরূপ কোন ফসিলের হদিস অদ্যাবধি মেলেনি।

৫. Douglas H Erwin and James W. Valentine, *The Cambrian Explosion: The Construction of Animal Biodiversity* (Greenwood Village, CO: Roberts and Company Publishers, 2013).

৬. Charles Darwin, *On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*, p. 306-307.

1. Charles Darwin, *On the Origin of Species by Means of Natural Selection*, Chapter 4, p. 82.
2. Charles Darwin, *On the Origin of Species*, Chapter 1: "Variation Under Domestication" & Chapter 6: "Difficulties on Theory", p. 194
3. Theodosius Dobzhansky, *Genetics and the Origin of Species* (New York: Columbia University Press), p. 21-45; মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব*, পৃ. ৫৫; আরিফ আজাদ ও রাফান আহমেদ, *সত্যকথন* (১ম খণ্ড), অধ্যায় : ‘ক্ষুদ্র পরিবর্তন বনাম প্রজাতিরান্তর’।
8. শেখ আব্দুল মাবুদ, *বিবর্তন তত্ত্ব : ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন* (রাজশাহী : তত্ত্বী পাবলিকেশন্স, ২০০০), পৃ. ৪।

দ্বিতীয়ত মধ্যবর্তী রূপের (The Missing Links Issue)

অভাব : ডারউইনীয় ক্রমান্বয়িক বিবর্তন প্রক্রিয়া সত্য হ'লে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতিতে ধাপে ধাপে রূপান্তরের সময় মাঝের রূপগুলো (Transitional Forms যেমন: অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক মাছ, অর্ধেক উভচর) জীবাশ্ম হিসাবে থাকার কথা ছিল, যাকে ডারউইন innumerable transitional forms বলে উল্লেখ করেছিলেন। অথচ জীবাশ্মবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ধারণাকৃত মধ্যবর্তী রূপগুলোর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ডারউইন নিজেই এই মধ্যবর্তী জীবাশ্মের অভাবের কথা স্বীকার করে বলেছিলেন, 'যদি কোটি কোটি বছর ধরে এই রূপান্তর ঘটে থাকে, তবে কেন আমরা প্রকৃতির সব জায়গায় বা জীবাশ্ম স্তরে সেই অগনিত মধ্যবর্তী রূপগুলো দেখতে পাই না?'^৭ এই শূন্যতা ও অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দেয়ার চেষ্টা করেছেন এই বলে যে, এসব মধ্যবর্তী রূপের জীব জীবাশ্মে পরিণত হওয়ার আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা সেগুলো এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। বোঝাই যায় যে, এ কথার কোন সারবত্তা নেই বরং নিতান্তই কাল্পনিক। যদি থাকত তবে এর পক্ষে অন্তত বিশ্বাসযোগ্য একটি প্রমাণ হ'লেও তো থাকার কথা ছিল!

মজার ব্যাপার হ'ল, বিবর্তবাদের প্রমাণ হিসাবে ইতিহাস ও বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে 'বনমানুষ ও মানুষের মধ্যবর্তী রূপসমূহ' বা আদিম মানুষের ক্রমবিবর্তনের একটি চিত্র দেখানো হয়। অথচ এই চিত্রটি কেবলই এক ভ্রান্ত কল্পনা। বনমানুষ থেকে ক্রমান্বয়ে মানুষে রূপান্তরের যে ছবিগুলো দেখা যায় (যা বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় March of Progress বা The Road to Homo Sapiens নামে আখ্যা দেয়া হয়), তা কেবল সাধারণ মানুষের কাছেই বিভ্রান্তিকর নয়, বরং আধুনিক জীবাশ্মবিজ্ঞান ও জিনতত্ত্বও তা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

মূলত, ১৯৬৫ সালে Life Nature Library সিরিজের Early Man (আদি মানব) নামক বইটির জন্য চিত্রশিল্পী রুডলফ জ্যালিংগার (Rudolph Zallinger) এই কাল্পনিক চিত্রটি আঁকেছিলেন। ছবিটিতে বাম থেকে ডানে ১৫টি ভিন্ন ভিন্ন বিলুপ্ত ও আধুনিক প্রজাতিকে এক সারিতে হেঁটে যেতে দেখা যায়। প্রথমে নীচু ও কুঁজো হয়ে হাঁটা এক প্রজাতি (Pliopithecus), মাঝখানে ক্রমান্বয়ে কিছুটা সোজা হয়ে হাঁটা মধ্যবর্তী কিছু রূপ (যেমন: Australopithecus, Homo erectus) এবং শেষে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আধুনিক মানুষ (Homo sapiens)। এটি কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আঁকা হয়নি, বরং সাধারণ মানুষের সামনে বিবর্তনকে সহজভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে এটি একটি কাল্পনিক রূপক হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে টি-শার্ট, কার্টুন, বিজ্ঞাপনে এই ছবিটির অসংখ্য চিত্র প্রচারিত হওয়ায় ছবিটি মানুষের মনস্তত্ত্বে বিবর্তনের

তথাকথিত প্রমাণ হিসাবে স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়।^৮

বিখ্যাত বিবর্তনবাদী জীবাশ্মবিদ স্টিফেন জে গোল্ড (Stephen Jay Gould) তার ১৯৮৯ সালে রচিত Wonderful Life গ্রন্থে এই চিত্রটির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এই একটি একক ছবি মানবজাতির মনে বিবর্তন সম্পর্কে সবচেয়ে বড় ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে। তার মতে, এটি বিবর্তনের কোন বৈজ্ঞানিক চিত্র নয়, বরং এটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া একটি বিভ্রান্তিকর রূপক মাত্র (Canonical icon)।^৯

বিবিসি'তে ২০১৭ সালে বিজ্ঞান সাংবাদিক কলিন ব্যারাসের একটি দীর্ঘ প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয় যে, মানুষ ও বনমানুষের সর্বশেষ সাধারণ পূর্বপুরুষ (Last Common Ancestor) সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনো একমত হ'তে পারেননি। এমনকি সেই পূর্বপুরুষ দেখতে কেমন ছিল, তা নিয়েও নেই কোন একমত।^{১০}

২০২১ সালে মর্যাদাপূর্ণ বিজ্ঞান সাময়িকী Science-এ প্রকাশিত এক পর্যালোচনায় আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রির গবেষক সের্হিও আলমেসিহা ও তাঁর সহকর্মীরা দেখান যে, গত দেড়শ বছরে ৫০টিরও বেশী বনমানুষ-গোত্র (Fossil ape genera)-এর জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হ'লেও এদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য থেকে ডারউইনের কাল্পনিক মানুষ বা বনমানুষের সম্ভাব্য একক পূর্বপুরুষের কোন ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না।^{১১}

তৃতীয়ত, জীবনের আগমন প্রশ্নের উত্তরহীনতা : বিবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হ'ল, কোথা থেকে এবং কিভাবে এলো পৃথিবীর প্রথম জীবন? বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত Biogenesis নীতি অনুযায়ী 'জীবন কেবল সজীব বস্তু থেকেই আসতে পারে' অর্থাৎ জড় থেকে নয়, বরং জীবন থেকেই জীবন আসে।^{১২} কিন্তু ডারউইনবাদ দাবী করে, কোটি কোটি বছর আগে কোন এক আদিম জলাশয়ে নির্জীব রাসায়নিক উপাদানগুলো (Inanimate matter) স্বতঃস্ফূর্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় (Chemical Evolution) একত্র হয়ে পৃথিবীর প্রথম সজীব কোষটি তৈরি করেছিল। আর এভাবেই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়। অথচ এই ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান নীতি 'বায়োজেনেসিস'-এর সরাসরি পরিপন্থী।

১৯৫৩ সালে এক আমেরিকান রসায়নবিদ স্ট্যানলী মিলারের পরীক্ষা থেকে বিবর্তনবাদীরা ক্ষীণ আশা দেখেছিল যে, হয়ত

৮. David P Barash, *The 'March of Progress' Has Given Us a Wrong Idea of Evolution* (Nautilus, February 23, 2021).

৯. Stephen Jay Gould, *Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History* (New York: W. W. Norton & Company, 1989), p. 27-36.

১০. <http://www.bbc.com/earth/story/20170517-we-still-dont-know-what-the-last-common-ancestor-of-humans-and-apes-looked-like>.

১১. *Fossil Apes and Human Evolution*, Science 372, no. 6542 (May 7, 2021): eabb4363. <https://doi.org/10.1126/science.abb4363>.

১২. James Strick, *Evolution & The Spontaneous Generation* (Continuum International Publishing Group, 2001), p. xi-xxiv.

৭. Charles Darwin, *On the Origin of Species by Means of Natural Selection, Chapter IX: Difficulties on Theory*, p. 171.

এর মাধ্যমে প্রাণ-পূর্ব পৃথিবীতেও প্রাণের প্রাথমিক অণু (অ্যামিনো এসিড) তৈরির সম্ভাব্যতা দেখানো যাবে। কিন্তু সেখান থেকে স্ব-প্রতিলিপিকারী (self-replicating) একটি জীবকোষে পৌঁছানোর পথ অর্থাৎ প্রথম জেনেটিক কোড (Genetic Code) কিভাবে এলো এবং নির্জীব রাসায়নিক অণুগুলো কিভাবে কোন বুদ্ধিমান নির্দেশনা ছাড়া নিজে নিজে একটি জটিল ডিজিটাল বায়োলজিক্যাল কোড তৈরি করল এবং তা বংশগতির মতো নিখুঁত প্রক্রিয়ায় পরিচালনা করতে শুরু করল, তার কোন যৌক্তিক জবাব তাদের কাছে পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে ভূ-রসায়নবিদদের গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, মিলার তাঁর ল্যাবরেটরিতে আদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের যে রূপ কল্পনা করেছিলেন, বাস্তব আদি পৃথিবীর পরিবেশ তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।^{১৩}

অবশেষে ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর ১৮৫৯-৬১ সালে তার বিখ্যাত রাজহাঁস-গ্রীবা ফ্লাস্ক (swan-neck flask) পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, খাদ্য-বস্তু ভর্তি ফ্লাস্কের মুখ যদি বন্ধ রাখা হয় এবং নির্জীব বা প্রজনন ক্ষমতা রহিত করে দেয়া হয়, তাহলে তাতে কোন জীবাত্মের উদ্ভব ঘটে না। তার এই পরীক্ষার মাধ্যমে ‘স্বতঃস্ফূর্ত প্রজনন’ (spontaneous generation) তত্ত্ব চিরতরে বাতিল হয়।^{১৪} ফলে জীববিজ্ঞানের মূল ভিত্তি Origin of Life & Molecular Biology দিয়েই ডারউইনবাদের এই দাবী চরম ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়।

সংক্ষেপে, বিবর্তন তত্ত্ব কেবল ‘বিদ্যমান জীবপ্রজাতির পরিবর্তন’ কিভাবে ঘটে তা ব্যাখ্যা করার দাবী করলেও, প্রথম সজীব কোষটির উদ্ভব কিভাবে হ’ল, কিভাবে শূন্য থেকে জটিল জেনেটিক কোড ও জীবিত কোষব্যবস্থা তৈরি হ’ল, সেই মূল প্রশ্নের সামনে এসে বিবর্তনবাদ সম্পূর্ণ উত্তরহীন ও অমীমাংসিত থেকে যায়।

পৃথিবীর কোন বিবর্তনবাদী এই রহস্যের সমাধান দিতে পারে নি। এজন্য সাণ্ডিয়াগো ফ্রিডম্যান ইনস্টিটিউটের ভূ-রসায়নবিদ জেফরী বাদা ১৯৯৮ সালে Earth ম্যাগাজিনে স্বীকার করেন যে, ‘আজ এই বিংশ শতাব্দী ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে সবচেয়ে বড় যে অমীমাংসিত সমস্যাটির মুখোমুখি আমরা হচ্ছি...

সেটি হ’ল, ভূপৃষ্ঠে প্রাণের সঞ্চার হ’ল কিভাবে?^{১৫} অনুরূপভাবে ১৯৯৪ সালে সায়েন্টিফিক আমেরিকান-এর প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী অধ্যাপক লেসলি অরগেল নিজেই স্বীকার করেন যে, ‘এটা একেবারেই অসম্ভব যে, গঠনগতভাবে জটিল প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড উভয়ই একই সময় একই জায়গা হতে উৎপন্ন হবে... প্রথম দৃষ্টিতে একজন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হ’তে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে প্রাণ কখনও রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরী হ’তে পারতো না’।^{১৬}

এভাবে বিবর্তনবাদীদের সকল ধারণাগুলো ধারাবাহিকভাবে হতাশায় পর্যবসিত হয়েছে এবং বাস্তবতা ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাদের প্রচেষ্টাগুলো একের পর এক মুখ খুঁড়ে পড়েছে।

(ক্রমশঃ)

১৫. Jeffrey L. Bada, Biochemistry: Origins of Life on Earth, Earth (1998), 7(1), p. 40.

১৬. Leslie E. Orgel, The Origin of Life on the Earth, Scientific American (1994), 271(4), p. 53-61.

নিরাময় হোমিও হল

পলিপাস (নাকের মাংস বৃদ্ধি) খাবার ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসায় সুস্থ হবে ইনশাআল্লাহ

পলিপাস-এর লক্ষণ

- * নাক প্রায় সময় বন্ধ হয়ে থাকে।
- * সারাক্ষণ মাথা ব্যথা করে।
- * সব সময় ঠাণ্ডা লেগে থাকে।
- * অল্পতেই সর্দি-কাশি লেগে যায়।
- * শরীরে এলাজির পরিমাণ বেড়ে যায়।
- * নাক সুঁড় সুঁড় করে, অনেক হাঁচি হতে থাকে।
- * ধূলা, ধোয়া, কুয়াশা, গন্ধ কোনটাই সহ্য হয় না।
- * কান সুঁড় সুঁড় করে, নাক তালু, গলার মধ্যে ভীষণ চুলকায়।

জটিল রোগ সহ যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়ঃ

- ♦ মাথা ব্যথা
- ♦ টিউমার
- ♦ কান পাকা
- ♦ বাত ব্যথা
- ♦ গ্যাস্ট্রিক
- ♦ ঘন ঘন ঝাঁব
- ♦ সাদাম্ভাব
- ♦ মসিকের সময় ব্যথা
- ♦ জন্ডিস
- ♦ যৌন সমস্যা
- ♦ চর্মরোগ
- ♦ হাঁপানি
- ♦ প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া
- ♦ ব্রণ
- ♦ মুখের কালা দাগ
- ♦ হার্মিয়া
- ♦ মেয়েদের বাঁধকের সমস্যা
- ♦ মূত্র পাথরী
- ♦ পিত্ত পাথরী
- ♦ পাইলস
- ♦ গুজারিয়ান সিস্ট
- ♦ বাচ্চা না হওয়া



DR AL AMIN AKASH
D.H.M.S., B.H.M.E.C (DHAKA)
Reg-41397

০ 01711106466

০ 01768680036 (WhatsApp)

- ১) চেম্বারঃ সাতার, ঢাকা
- ২) চেম্বারঃ নওদাপাড়া, রাজশাহী

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম., এম.এ)।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :

স্মার্ট ট্র্যাক্স এ্যান্ড ট্রাভেলস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।

সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা

মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

হাদীছ অনুযায়ী আমল

-মূল (ফার্সী): মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী

অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি যদি তার পিতা, মাতা, বোন ও দাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তাহ'লে সবার সম্পত্তি থেকে পাওয়া অংশ মিলিয়ে তার মোট সম্পদ অনেক বেশী হয়ে যাবে। যদিও এই সম্পদগুলো সে তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।

অতএব তৎকালীন পরিস্থিতির কারণে অধিকাংশ মুজতাহিদের কাছে সনদের শর্ত পূরণকারী অনেক হাদীছ পৌঁছতে পারেনি। ফলে এহেন পরিস্থিতিতে তাঁরা ইজতিহাদের ময়দানে আল্লাহর সম্ভষ্টির জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মানবীয় স্বভাবের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং সেই সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রে হাদীছের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে হাদীছসমূহ ব্যাপকভাবে সংকলিত হওয়ার ফলে মতভেদপূর্ণ জায়গাগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় (হাদীছ স্পষ্ট হওয়ার পর) ইমামদের সেই বক্তব্য বর্জন করতে দ্বিধা কোথায়? কেউ কেউ মনে করেন, হানাফী হিসাবে পরিচিত হওয়াও দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়। তাই আমরা যদি ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর কোন মতের বিরোধিতা করি তাহ'লে আর হানাফিয়াত অবশিষ্ট থাকবে না। এ ধারণার বিস্তারিত জবাব বোঝা প্রয়োজন।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর দিকে সম্পৃক্ত করে যে মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করা হয় সেগুলো দুই ধরনের। প্রথমত, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নিজস্ব মতামত-যেগুলো ফিক্বহের কিতাবে عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (আবু হানীফা থেকে বর্ণিত) বলে উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয়ত, উদ্ভাবিত মাসআলা-যা পরবর্তী আলেমগণ ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর বক্তব্য থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে বের করেছেন এবং সেগুলোকে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব হিসাবে প্রসিদ্ধ করেছেন। ফিক্বহের গ্রন্থগুলোতে এগুলোকে عِنْدَ أَبِي (আবু হানীফার মতে) বলে উল্লেখ করা হয়। এটাকে বলা যায়, ইজতিহাদের মধ্যে আরেক ইজতিহাদ। প্রথম প্রকারের মতগুলো ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নিজস্ব ইজতিহাদ ছিল, যা সরাসরি কুরআন ও হাদীছ থেকে সংগৃহীত। এরপর আবার সেই মতামতগুলো থেকে অন্যান্য মাসআলা উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই মাসআলাগুলোতে দুই ধরনের ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা প্রত্যেক ইস্তিহাতের মধ্যেই একটি ভুলের সম্ভাবনা থাকে। আর এসব কারণে কিছু কিছু মাসআলায় ইমাম ছাহেবের ছাত্রবৃন্দ ও অন্যান্য আলেমগণ ইমাম ছাহেবের মাযহাব থেকে সরে এসেছেন। এমনকি এই মুকদ্দিসরাও সেসব ক্ষেত্রে অন্যান্য আলেমদের মত গ্রহণ করেছেন এবং স্বয়ং ইমাম আবু হানীফার তাক্বীদ ত্যাগ করেছেন। ফলে তারা কোন জায়গায় হানাফী, কোন জায়গায় আবু ইউসুফী, কোন জায়গায় মুহাম্মাদী, কোন জায়গায় যুফারী, আবার কোন জায়গায় আবুল

লায়ছী বনে গেছেন। তাহ'লে তাদের হানাফিয়াত আর অবশিষ্ট থাকল কোথায়?

আর যদি বলা হয় যে, তারা তো আবু হানীফা (রহ.)-এর শাগরিদ বা ছাত্র ছিলেন; তাহ'লে অন্য কেউ বলবেন যে, কোন কোন ইতিহাসবিদ ইমাম শাফেঈ (রহ.)-কেও তাঁর শাগরিদ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আর যদি ধরে নিই যে, তারা তাঁর শাগরিদ ছিলেন, তবে সে কথা মাত্র দু'ব্যক্তির ক্ষেত্রে খাটে। তারা হ'লেন আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ। অন্য সকল আলেমের ক্ষেত্রে তো এই সম্পর্ক ছিল না। এছাড়াও যদি কোন ব্যক্তি আমার কোন বিষয়ে বিরোধিতা করে-চাই সে আমার অনুসারীদের একজনই হোক না কেন, তবুও আমি তাকে বিরোধী ছাড়া অন্য কিছুই বলব না। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে আমার বিরোধীর অনুসরণ করে; তাহ'লে সে ঐ নির্দিষ্ট মাসআলায় আর হানাফী থাকে না, বরং সে ঐ বিরোধীর মাযহাবপন্থী বলে বিবেচিত হবে। এই আলোচনা করার উদ্দেশ্য হ'ল, এ বিষয়টি স্পষ্ট করা যে, মুহাক্কিক আলেমদের উদ্দেশ্য হচ্ছে হকের অনুসরণ করা; কোন মানুষের সাথে নিজেই সম্পৃক্ত করা নয়। আরেকটা কথা এখানে উল্লেখ্য যে, ফিক্বহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি সম্পর্কে যারা খোঁজ-খবর রাখেন তারা জানেন ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এমন কোন গ্রন্থ লিখে যাননি, যার উপর ভিত্তি করে মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত ফিক্বহের গ্রন্থসমূহ যেমন- কানযুদ দাক্বায়েক, হেদায়া, আলমগিরী, কায়ীখান ইত্যাদিতে যে অগণিত মাসআলা রয়েছে তার সবই ইমাম ছাহেব থেকে বর্ণিত নয়। বরং হাতে গোনা অল্প কিছু মাসআলা ইমাম ছাহেবের সাথে সম্পর্কিত আর সিংহভাগই ছাহেবাইন (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ) থেকে বর্ণিত। আবার বহু মাসআলা পূর্ববর্তী আলেমদের কথা এবং অসংখ্য মাসআলা পরবর্তী আলেম যেমন হেদায়া, ফাতাওয়া, যাক্বীর ইত্যাদি গ্রন্থকারের কথা। যারা তাদের বুঝ অনুসারে মাসআলাগুলোতে لَا يَحْجُزُ وَ لَا يَحْجُزُ তথা 'জায়েয ও নাজায়েয' লিখে দিয়েছেন।

এটা স্পষ্ট যে, ইমাম আযম (রহ.)-এর তাক্বওয়ার কথা ক্রমাগত শুনতে শুনতে, তাঁর মাসআলাগুলো অনুধাবন করে এবং অন্তরের গভীর অনুভূতি থেকে তাঁর দ্বীনদারী ও প্রজ্ঞার প্রতি আমাদের মনে যে নিখাদ বিশ্বাস ও আস্থা তৈরী হয়েছে; নিজেদের হানাফী দাবী করা সকল আলেমের প্রতি আমাদের সেই আস্থা নেই। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি প্রসিদ্ধ এসব কিতাবে বর্ণিত কোন মাসআলাকে কুরআন ও হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে অথবা অপসন্দনীয় ইস্তিহাত মনে হওয়ার কারণে ঐ মাসআলা উপেক্ষা করেন, তাহ'লে প্রকৃতপক্ষে এতে কোন ত্রুটি নেই।

প্রসঙ্গত এখানে আরেকটি আলোচনা এসে যায় যে, ক্বিয়াস থেকে উদ্ভাবিত মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে কি করবে? জেনে রাখা উচিত যে, কুরআন ও হাদীছ নিয়মিত চর্চা ও অনুশীলনের ফলে কিছু কিছু লোকের মধ্যে ঈমানী আলোর তেজ, বিবেকের সুস্থতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এতখানি তৈরি হয় যে, সেই যোগ্যতাবলে ক্বিয়াস থেকে উদ্ভাবিত অধিকাংশ মাসআলার কোনটা হক ও কোনটা না-হক তা তাদের সামনে সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট হয়ে

ওঠে। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে এমন হয় যে, দলীল-প্রমাণ অনুধাবনের পর সত্য আপনা থেকে তাদের সামনে উন্মোচিত হয়ে যায়। এমন উন্মোচন ঘটলে তারা চোখ বন্ধ করে কারো তাক্বলীদ মেনে নেবে না। কেননা মানুষকে ক্বিয়ামতে তার নিজের আকল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে; অন্যের আকল সম্পর্কে নয়। সুতরাং জেনে-বুঝে সত্যের বিরোধিতা করলে সেজন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হ'তে হবে। ইমাম ছাহেবের দু'টি মতের দ্বিতীয় মত এ কথাকেই নির্দেশ করে।^১ যদি কেউ এ ধরনের যোগ্যতায় উপনীত হ'তে না পারেন তবে যুজ্জতাহিদদের মধ্যে যাকে বেশী দ্বীনদার বলে অনুমিত হবে সে তার তাক্বলীদ করবে। কারণ ব্যক্তি যখন ইজতিহাদ বা গবেষণার স্তরে পৌঁছতে পারে না তখন তাক্বলীদ ছাড়া তার অন্য উপায় থাকে না।^২ কিন্তু গবেষণা-ইজতিহাদের রাস্তা খুলে গেলে তাকে তাক্বলীদ থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করতে হবে। কারণ অন্ধ ব্যক্তি বাধ্য হয়ে অন্যের ওপর নির্ভর করে, কিন্তু যার দৃষ্টিশক্তি আছে সে কি ইচ্ছাকৃত চোখ বন্ধ করে প্রতিটি দেয়াল ও দরজায় হোঁচট খাবে?

এ থেকে স্পষ্ট হ'ল যে, প্রত্যেক সত্যসন্ধানী ব্যক্তির জন্য কুরআন ও হাদীছ শিক্ষা করা অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষ এটিকে অত্যন্ত কঠিন মনে করে এবং বলে যে, কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত কঠিন কাজ, যা অর্জন করার যোগ্যতা কেবল পূর্ববর্তী মনীষীদেরই ছিল। এজন্যই তৃতীয় অধ্যায়টি এই পথকে সহজ করার উদ্দেশ্যে রচনা করা প্রয়োজন মনে করলাম, যাতে এই মহা নে'মত অর্জনে মুমিনদের আত্মহ ও মনোবল বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান অর্জন সহজীকরণ

কুরআন মাজীদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর তাঁর ছাহাবীদের সামনে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা সবাই ছিলেন নিরক্ষর। এই নিরক্ষর লোকেরাই ছিলেন আল-কুরআনের প্রত্যক্ষ সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ। পরবর্তী অন্য সকল মানুষ তাঁদের অনুগামী ও পরোক্ষ শ্রোতা। কুরআনে ব্যবহৃত উপমা, দৃষ্টান্ত ও কথোপকথন-সবই আরব জাতির প্রচলিত রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরআনের সাথে কোন তাফসীর নাযিল হয়নি।

- যখন কোন মাসআলায় তিনি প্রথম একটি মত দিয়েছিলেন তখন দলীলসহই সে মত দিয়েছিলেন। অধিকতর যাচাইয়ে যখন তার সামনে ভিন্ন মতের দলীল অধিক সঠিক মনে হয়েছে তখন প্রথম মত পরিহার করে তিনি দ্বিতীয় মত দিয়েছেন। সুতরাং অধিকতর যাচাইয়ে আজও ইমাম ছাহেবের মতের বিপরীতে কুরআন-হাদীছের দলীল পাওয়া গেলে সেটা গ্রহণ করতে হবে। - অনুবাদক
- ইজতিহাদের যোগ্যতাহীন সাধারণ মানুষ বিজ্ঞ ও পরহেযগার আলেমের থেকে জেনে আমল করবে (নাহল ১৬/৪৩; আখিয়া ২১/৭)। তবে উচ্চলের পরিভাষায় একে অন্ধ 'তাক্বলীদ' না ব'লে 'ইত্তিবা' বা ফণ্ডওয়া অনুসরণ বলা উচিত। কারণ সাধারণ মানুষের জন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির অন্ধ আনুগত্য (তাক্বলীদে শাখছী) ওয়াজিব নয় (ইবনু হায়ম, আল-ইহকাম ফী উচ্ছলিল আহকাম, ৬/১১৯; আল-আমাদী, আল-ইহকাম ফী উচ্ছলিল আহকাম, ৪/২৮৩)। বরং তাদের মূল কাজ হ'ল, সমকালের সবচেয়ে দ্বীনদার, সুন্যাতের অনুসারী ও বিজ্ঞ আলেম বা মুফতীর নিকট থেকে শরী'আতের বিধান জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করা; যার পরিভাষাগত অবস্থান মাযহাবী তাক্বলীদের উর্ধ্বে (ইবনুল কাইয়াম, ইলমুল মুওয়াক্কিঈন, ৪/২৬১; শাতিবী, আল-মুওয়াফা'কাত, ৪/২৯২; শাওকানী, ইরশাদুল ফুহুল, ২/১০৩২)। - অনুবাদক

যদি নিরক্ষর লোকদের বোধশক্তি কুরআনের অর্থ বুঝায় যথেষ্ট না হ'ত তাহ'লে ছাহাবায়ে কেরাম কিভাবে কুরআন বুঝতেন এবং তার আদেশ-নিষেধ পালন করতেন? আল্লাহ তা'আলা সূরা ক্বামারের বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ, 'আমরা কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। উপদেশ গ্রহণের জন্য কেউ আছে কি? (ক্বামার ৫৪/১৭, ২২, ৩২, ৪০)। সুতরাং কুরআন বুঝা মুশকিল বললে এ আয়াতকে অস্বীকার করা হবে। মহান আল্লাহ পূর্বযুগের কুরআন পাঠকদের উপর রহমত বর্ষণ করণ, তারা কুরআন মাজীদে হরকত যোগ করে আমাদের জন্য শব্দতত্ত্ব (عِلْمُ الصَّرْفِ) ও বাক্যতত্ত্ব (عِلْمُ النَّحْوِ) শেখার প্রয়োজনীয়তা দূর করে দিয়েছেন। মানুষ কুরআন শরীফে যে আলিফ-লাম ও এই জাতীয় বিষয়ের সূক্ষ্ম গবেষণা করে থাকে, তার মূল কারণ হ'ল কিছু মানুষের কাছে কুরআন পাঠের উদ্দেশ্য কেবল আহকাম (বিধানাবলী) পালন করা। ফলে তাদের দৃষ্টি এসব অপ্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিকে ধাবিত হয় না। পক্ষান্তরে কিছু মানুষের উদ্দেশ্য থাকে কুরআন চর্চার মাধ্যমে নিজেদেরকে গবেষক আলেমদের সারিতে शामिल করা। তাই স্বভাবতই তাদের মন-মানসিকতা এসব চুলচেরা বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

এই কথাটির সত্যতা পার্থিব নানা দৃষ্টান্ত থেকেও উপলব্ধি করা যায়। যেমন-রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসকদের পক্ষ থেকে যখন কোন সরকারী পরোয়ানা জারি হয়, তখন তার প্রতিটি বাক্যে হাযারো সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার সুযোগ ও গবেষণামূলক আলোচনার অবকাশ থাকা সত্ত্বেও; সাধারণ প্রজা চাই শিক্ষিত হোক কিংবা অশিক্ষিত, আদেশ-নিষেধ অনুধাবন করা ছাড়া অন্য কোন দিকে নজর দেয় না। কারণ সেই পরোয়ানা পাঠের পেছনে তার মূল উদ্দেশ্য থাকে আদেশের আলোকে কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করা। কিন্তু কবিতা বা গল্পের বিষয় তেমন নয়। কারণ তা পাঠের উদ্দেশ্য কোন আদেশ বাস্তবায়ন করা নয়। ফলে প্রথর বুদ্ধিসম্পন্ন পাঠক এর সূক্ষ্ম বাক্যশৈলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং একটি শব্দ থেকেই শত শত অর্থ বের করে নেয়। অনুরূপভাবে হাদীছ শাস্ত্রেরও দু'টি শাখা রয়েছে। একটি হ'ল ইলমুল মাতন (علم

المُتَن) অর্থাৎ হাদীছের শব্দাবলী থেকে দ্বীনী মূল উদ্দেশ্য অনুধাবন করা; আর অপরটিকে বলা হয় ফান্নে আসানীদ (فن اسانيد) অর্থাৎ হাদীছের বর্ণনাক্রম বা সনদ বিশ্লেষণ করে এর গ্রহণযোগ্যতা ও দুর্বলতার স্তর নির্ধারণ করা। এসব বিদ্যা অর্জন মানুষের ঈমানী শক্তির উপর নির্ভর করে। যার ঈমান যত তেজোদীপ্ত হবে সে ততই কুরআন-হাদীছ থেকে শারঈ আহকাম উদ্ভাবন করতে পারবে এবং কুরআন-হাদীছের শব্দের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হবে। ঈমান দুর্বল হ'লেও অনুসরণের নিয়তে যে এই বরকতময় গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করবে সেও তা অনুধাবন করা থেকে বঞ্চিত হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছসমূহ ছিল আরবদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত সহজ, প্রাঞ্জল ও বোধগম্য ভাষায়, যা সাধারণ মরবাসী বেদুঈনদেরও বুঝতে সমস্যা হ'ত না।

কুরআন-হাদীছের অনুবাদও অধিকাংশ ভাষায় পাওয়া যায়। ফলে অনারবদেরও তা বুঝতে মোটেও অসুবিধা পোহাতে হয় না। অন্যান্য বই যেমন কাফিয়াহ, শাফিয়াহ, মুতাওয়াল, কিফায়াহ, হেদায়াহ, কামুস, কাশশাফ ইত্যাদির অবস্থা একটু ভাবুন! গ্রন্থগুলোর পাঠ (Text) বা মূল লেখা এতই সূক্ষ্ম ও ইঙ্গিতপূর্ণ যে, কেবল একটি গ্রন্থের মর্ম পুরোপুরি উদ্ধার করতে একজন মানুষের পুরো জীবন কেটে যেতে পারে। বিষয়টি আলেমদের কাছে অজানা নয়। ক্বিয়ামতের দিন কিন্তু এই কুরআন ও হাদীছ সম্পর্কে মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে, অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে নয়। আমাদের বুঝতে হবে যে, অন্যান্য গ্রন্থ পড়া হয় নিষেধ অথবা উপকারশূন্য। মূল কথা হ'ল, প্রয়োজনীয় বিষয়কে অপ্রয়োজনীয় বিষয় থেকে এবং উত্তম বিষয়কে নিম্নতর বিষয় থেকে পৃথক করতে হবে। যে বিষয় অধিক প্রয়োজনীয় ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ, প্রথমে সেটিই গ্রহণ করতে হবে। এরপর সময়-সুযোগ অবশিষ্ট থাকলে যে গ্রন্থের প্রতি স্বভাবত আগ্রহ রয়েছে সে গ্রন্থ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করা যেতে পারে। কবি বলেন,

عمر قليل آمد و علمت كثير + آنچه ضروريست همان پیش گیر

‘জীবন যে হয় সংক্ষিপ্ত অতি, জ্ঞান যে অগাধ সিদ্ধ,

যা কিছু পাও আবশ্যিক, তা-ই তুলে নাও বিন্দু বিন্দু’।

ইলমুল আসানীদ বা সনদবিজ্ঞান হ'ল, হাদীছ বর্ণনাকারী রাবীদের পুরো অবস্থা যথাযথভাবে জানা এবং তাঁদের সংখ্যা কম না বেশী তা জানার বিদ্যা। কারণ হাদীছের শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা নির্ভর করে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা, তাঁদের দুর্বলতা ও যোগ্যতার ওপর। আর সনদ হ'ল এমন কোন নির্ভরযোগ্য উস্তাদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করা, যার সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পর্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছাকাছি সময়ে এ ধরনের সনদ অর্জন আমাদের যুগের তুলনায় অনেক সহজ ছিল। হেদায়াতের সেই প্রাথমিক যুগ আমাদের থেকে বহু দূরে চলে গেছে। আবার পূর্বযুগের আলেমগণ যেমন কুতূবে সিদ্দাহ প্রভৃতি গ্রন্থের সংকলকদের ফাক্বাহাত বা জ্ঞানগরিমা দিবালোকের মতো স্পষ্ট ছিল। তারা প্রতিটি হাদীছ সনদসহ তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। অতঃপর এখন মুতাওয়াজিরভাবে তাদের গ্রন্থ থেকে মানুষ হাদীছ বর্ণনা করে চলেছেন। ফলে বর্তমানে এসব গ্রন্থ পরিবর্তন বা বিকৃত করা অসম্ভব। তারা হাদীছ বর্ণনাকারী রাবীদের অবস্থা আসমাউর রিজাল শাস্ত্রে সংকলন করে গেছেন। এ ধরনের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সংকলিত ও সংরক্ষিত হওয়ার পর পৃথকভাবে সনদ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই দূর হয়ে গেছে। مَنْ حَرَّبَ الْمُحَرَّبَ حَلَّتْ بِهِ الدَّامَةُ ‘পরীক্ষিত জিনিস যে পরীক্ষা করে পরিণামে সে অনুশোচনা ভোগ করে’।

অতএব কোন ব্যক্তি যদি উদাহরণস্বরূপ ছহীহ বুখারী দেখেন, তাহ'লে মনে হবে যেন তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাদিল আল-বুখারী (রহ.)-এর কাছ থেকেই সনদ গ্রহণ করছেন। কারণ তিনি তাঁর গ্রন্থে নিজের সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। সুতরাং কেউ যখন ছহীহ

বুখারীতে কোন হাদীছ খুঁজে পেল, তখন যেন তিনি তা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখ থেকেই শুনল। অনুরূপভাবে মিশকাতুল মাছাবীহ-এর সংকলকও তাঁর ভূমিকার মধ্যে এ কথাই জানিয়েছেন যে, আমরা যখন আমাদের হাদীছসমূহকে নির্ভরযোগ্য ছহীহ গ্রন্থগুলোতে দেখতে পেয়েছি, তখন মনে হয়েছে যেন আমরা সেগুলো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছ থেকেই সনদের মাধ্যমে গ্রহণ করেছি। কারণ এসব গ্রন্থের সংকলকগণ আমাদের পৃথকভাবে সনদ গ্রহণের প্রয়োজন থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে আরও বহু মুহাদ্দিছ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যে, বর্তমান যুগে সনদ মূলত একটি প্রচলিত রীতি হিসাবেই অবশিষ্ট রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণকে তার রহমতের বারিধারায় সিক্ত করুন! তাঁরা জাল ও নির্ভেজাল হাদীছকে পৃথক করেছেন, ছহীহ ও দুর্বল হাদীছকে আলাদা করেছেন এবং হাদীছের বিভিন্ন স্তর ও মর্যাদা অনুযায়ী সেগুলো তাঁদের গ্রন্থসমূহে সংকলন করেছেন। তাঁরা প্রতিটি বিষয়কে আলাদা আলাদা অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন। হাদীছের গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, হাদীছসমূহের মধ্যে খবরিয়াত (خبريات) বা সংবাদমূলক (আক্বীদাহ, ইতিহাস অথবা পরকালীন সংবাদ সংক্রান্ত) মাসআলাও অগণিত রয়েছে। বর্তমানে হাদীছশাস্ত্র অধ্যয়ন করাও ফিক্বহের গ্রন্থসমূহের মত অনেক সহজবোধ্য হয়ে গেছে। কোন একটি মাসআলা সামনে এলে, সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে তা অনুসন্ধান করলেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশনা পাওয়া যাবে। বরং কোন কোন দিক থেকে ফিক্বহের চেয়েও হাদীছ বুঝা সহজ। কারণ ফিক্বহের কিতাব অগণিত এবং আলেমগণ সেগুলোতে পরস্পরবিরোধী মত দিয়েছেন। যদি এক গ্রন্থে কোন মাসআলা জায়েয লেখা থাকে তবে প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে যে, অন্য গ্রন্থে তা নাজায়েয লেখা থাকবে। আবার কোন মত অনুযায়ী আমল করা হবে সেটাও লেখা নেই।

কোথা থেকেই বা এতসব গ্রন্থ এক জায়গায় করা যাবে? আর সেসব গ্রন্থে খুঁজে খুঁজে আল্লাহর বিধান বের করার এত সময়ই বা কোথায়? শ্রুত ও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হাদীছ অসংখ্য হ'লেও বহুলাংশে তা জাল বা মওযু। মুহাদ্দিছগণ তাদের মুসনাদ গ্রন্থাবলীতে যেসব হাদীছ সংকলন করেছেন তার সংখ্যা সীমিত ও গণনাকৃত। তারা তাদের গ্রন্থে ছহীহ হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলন করে তার সংখ্যা বলে দিয়েছেন। এ বিষয়টি জ্ঞানীদের নিকট অজানা নয়। হাদীছের গ্রন্থগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাসেখ (রহিতকারী) ও মানসূখ (রহিত) হাদীছ এক পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে, ফলে অনুসন্ধানকারীদের তা নিয়ে পেরেশান হ'তে হয় না।

হাদীছটি রহিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এমন আশঙ্কায় কোন হাদীছের উপর আমল পরিত্যাগ ঠিক হবে না। কেননা রহিত হওয়ার এ সম্ভাবনা তো সকল হাদীছের বেলায় প্রযোজ্য। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের সকল কথা সংগৃহীত হয়নি। বরং অনেক কথাই হাতছাড়া হয়ে গেছে। আর এমন হ'লে তো কোন মুজতাহিদের জন্যই একটা হাদীছের উপরও আমল সমীচীন হবে না।

[বাকী অংশ ৪৩ পৃষ্ঠা দ্রা]

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

এক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নাসেখ হাদীছ কারো কাছে না পৌঁছে ততক্ষণ পর্যন্ত মানসূখ হাদীছ তার ক্ষেত্রে মানসূখ গণ্য হবে না যদিও বাস্তবে তা মানসূখ। যখন নাসেখ হাদীছ পৌঁছাবে তখন মানসূখ হাদীছের উপর আমল আদৌ জায়েয হবে না। রাবী‘আ (বাহরাইন) গোত্রের জন্য حَسْمٌ (হানতাম বা সবুজ কলস) ও دُبُّعٌ (দুবুউ বা লাউয়ের খোলার পাত্র) ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা ততদিন পর্যন্ত মানসূখ হয়নি যতদিন পর্যন্ত না নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার নাসেখ হাদীছ তাদের হাতে পৌঁছেছে। অতএব সূন্নাহের অনুগামী কর্তব্য হবে জীবনভর যদি তার হাতে একটি হাদীছও হস্তগত হয় এবং আর কোন হাদীছের দেখা না মেলে তবুও সে সেই একটি হাদীছকে মহামূল্যবান মনে করে ঝাঁকড়ে ধরে রাখবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ أَنِّي وَكَلْتُ أُمَّيَّةً (‘একটা আয়াত হ’লেও আমার পক্ষ থেকে তা পৌঁছে দাও’)—এর মর্ম এটাই। কিতাবসমূহ অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, পূর্ববর্তী আলেমগণও নাসেখ হাদীছ হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত মানসূখ হাদীছের উপর আমল করতেন।

পরস্পর বিরোধার্থক হাদীছ সমূহও (أَحَادِيثُ مُعَارِضَةٌ) হাদীছ গ্রন্থে এক জায়গায় লেখা হয়ে থাকে, যাতে একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই বিরোধ দূর হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)—এর কথার মধ্যে দৃশ্যত কোন বিরোধ থাকার কথা নয়। কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের চোখে তা বিরোধপূর্ণ মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি হাদীছের অর্থ ও প্রয়োগের ক্ষেত্র ভিন্ন হয়ে থাকে। হাদীছের প্রকারভেদ সম্পর্কে একটি কথা বাকী রয়েছে। তা এই যে, ‘উছুলে হাদীছ’ বা হাদীছের মূলনীতি শাস্ত্রের আলেমগণ হাদীছের অনেক প্রকার বর্ণনা করেছেন। যেমন ছহীহ, হাসান, আহসান, গরীব, মুরসাল, মারফূ, মওকূফ, মাকতূ ইত্যাদি। হাদীছের এত সব মাত্রা বা স্তর প্রত্যেকের মস্তিষ্ক দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে না। ফলে হাদীছের উপর আমল থমকে যেতে পারে। আমাদের বুঝতে হবে যে, হাদীছের প্রকারভেদগুলোর এই আধিক্য মূলত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও শর্তের পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে। যত বেশী শর্ত ও দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করা হবে, প্রকারের সংখ্যা তত বাড়তেই থাকবে; আর যত শর্ত কমানো হবে, প্রকারের সংখ্যাও তত কমে আসবে। যেমন মানুষ দুই প্রকার হ’তে পারে, যথা: শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়। আবার হাযার প্রকারও হ’তে পারে। যথা: সাদা, কালো, লাল, বাদামী, পিঙ্গল, লম্বা গলা, খাটো গলা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু হাদীছের ক্ষেত্রে প্রকারভেদ অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার কারণে সাধারণ আমলকারীদের মধ্যে প্রচুর দ্বিধাবোধ বা সন্দেহ সৃষ্টি হয়।

উছুলে হাদীছ শাস্ত্রের আলেমগণ হাদীছের প্রকার নির্ণয়ে চমৎকার ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন। হাদীছের ওপর আমলকারীরাও যদি নিজেদের সামনে একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি রাখেন, তাহ’লে তাতে অনেক উপকার হবে। সেই সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিটি হ’ল, মওযু‘ (জাল) নয় এমন সব হাদীছ মূলত দুই প্রকার: শক্তিশালী (قوي) ও দুর্বল (ضعيف)। শক্তিশালী সেই হাদীছকে বলে যার বর্ণনাকারীগণ অজ্ঞাত নন

এবং তাদের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত। আর দুর্বল সেই হাদীছকে বলে যার বর্ণনাকারীদের সনদ অজ্ঞাত নয়; কিন্তু সেই বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা (ثقات) এবং অন্যান্য অবস্থা যথাযথভাবে প্রমাণিত নয়। সবল হাদীছকে তারা আবার দুই প্রকার বলে থাকেন। কোন হাদীছ বা তার বিষয়বস্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করলে সেটি মুতাওয়াতির। আর যদি এমন না হয় তাহ’লে সেটি গায়রে মুতাওয়াতির। অন্যান্য কিতাবে ওলামায়ে কেরাম মুতাওয়াতির হাদীছের বর্ণনাকারীর নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করেননি। এর কারণ হ’ল, রাবীদের অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে তাওয়াত্বের জন্য নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই। যখন কোন বর্ণনা সামগ্রিকভাবে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিয়ে দেয়, তখনই সেটি মুতাওয়াতির হিসাবে গণ্য হয়। তবে এ কথা অস্পষ্ট নয় যে, যখন রাবীগণ বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হন, তখন তাঁদের তিনজনের বর্ণনাও নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে। এ কারণে এখানে তা তিনজন রাবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

মুতাওয়াতির হাদীছ অকাটা দলীল (نَصٌّ قَطْعِي)। অমুতাওয়াতির হাদীছ প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সত্য বলে বিবেচিত (مظنون الصدق بظن غالب)। আর দুর্বল হাদীছ সত্য ও মিথ্যা উভয়েরই সম্ভাবনায়ুক্ত। দুর্বল হাদীছ ক্রিয়ামত, বারযাখ, জাহান্নাম, জান্নাত, ভয় প্রদর্শন, উৎসাহ প্রদান এবং এ ধরনের বিষয়সমূহে গ্রহণ করা হবে। আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রেও হদ, কিছুছাড়া ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া, যদি এর বিপরীতে কোন শক্তিশালী হাদীছ না থাকে; তাহ’লে তার ওপর আমল করা হবে। আর যদি শক্তিশালী হাদীছ এর বিরোধী হয়, তাহ’লে তা (যঈফ হাদীছ) পরিত্যাগ করতে হবে। এছাড়াও যদি পরবর্তীতে একই বিষয়বস্তুর তিনটি দুর্বল হাদীছ পাওয়া যায়, তাহ’লে সেগুলো শক্তিশালী হাদীছের বিধান লাভ করবে।^৩ মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা অমুতাওয়াতির হাদীছকে রহিত করা জায়েয। শক্তিশালী অমুতাওয়াতির হাদীছের মাধ্যমে প্রমাণিত কোন বিধানের উপর আমল করা ফরয এবং তা অস্বীকারকারী কাফের। হাদীছের এই পরিমাণ প্রকারভেদ ও বিধান প্রত্যেক আমলকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী জানা যক্ররী এবং যথেষ্ট।

৩. মাননীয় লেখকের এই বক্তব্যটি সঠিক নয়। কয়েকটি যঈফ হাদীছ একত্র হ’লেই তা ছহীহ হাদীছে পরিণত হয় না। উছুলে হাদীছ অনুযায়ী হাদীছের ছহীহ বা যঈফ হওয়া সনদ ও মতনের গ্রহণযোগ্যতার ওপর নির্ভর করে, যা কোন সংখ্যাগত বিষয় নয় (ইবনু হাজার, নুযহাতুন নাযার, পৃ. ৮০-৮৫; ইবনুছ ছালাহ, মুকাদ্দিমাহ ইবনুছ ছালাহ, পৃ. ৩৪-৩৬)। তবে সামান্য দুর্বলতাসম্পন্ন হাদীছ একাধিক স্বতন্ত্র সনদে বর্ণিত হ’লে তা ‘হাসান লিগায়রিহী’ (حسن لغيره) পর্যায়ে উন্নীত হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ‘কয়েকটি যঈফ হাদীছ মিলে একটি ছহীহ হাদীছ হয়ে গেল’। বরং এটি হাসান লিগায়রিহী, যা পরিভাষাগতভাবে ছহীহ লিখাতিহির সমান নয় (ঐ)। পক্ষান্তরে বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী বা অতি দুর্বল হ’লে একাধিক সনদ থাকলেও তা শক্তিশালী হয় না (সাখাবী, ফাতহুল মুগীছ, ১/৬৮-৭০)। অতএব অকীদা ও হালাল-হারামসহ শরী‘আতের কোন বিধানেই যঈফ হাদীছ একক দলীল হ’তে পারে না; বরং মূল বিধান কুরআন বা ছহীহ হাদীছে প্রমাণিত থাকলে একে কেবল সহায়ক প্রমাণ (শাহিদ ও মুতাবা‘আত) হিসাবে উল্লেখ করা যায় (ইমাম মুসলিম, মুকাদ্দিমাহ ছহীহ মুসলিম, ১/৭; ইবনু তাযমিয়াহ, মাজমু‘উল ফাতাওয়া, ১/২৫০; শাতিবী, আল-ইতিহাম, ১/২৪০) -অনুবাদক।

উইঘুর মুসলিম নির্যাতন ও মানবাধিকার সংকট : একটি ঐতিহাসিক ও সমকালীন বিশ্লেষণ

-ড. মোহাম্মাদ আজিব্বার রহমান*

ভূমিকা

ইসলামী শরী‘আতের প্রধান উদ্দেশ্য মানুষকে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও জাতি পরিচয় নির্বিশেষে কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ করা।^১ পবিত্র কুরআনে সমগ্র মানবজাতিকে মর্যাদা দান করা হয়েছে (ইসরা ১৭/৭০)। আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় মানবাধিকার রক্ষা সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক নীতি, যা জাতিসংঘ সনদ, মানবাধিকার বিষয়ক সার্বজনীন ঘোষণা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে স্বীকৃত। তবুও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতিগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চরম উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব ঘটনার মধ্যে চীনের জিনজিয়াং উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বসবাসকারী উইঘুর মুসলিমদের উপর নির্যাতন ও মানবাধিকার পরিস্থিতি অন্যতম। চীন সরকার বিপুলসংখ্যক উইঘুর ও অন্যান্য তুর্কিভাষী মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর তথাকথিত ভৌকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে আটক রাখা, ব্যাপক নয়রদারী, ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে বিধিনিষেধ, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, জোরপূর্বক শ্রম, জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি এবং সাংস্কৃতিক আত্মীকরণের মাধ্যমে বর্বর নির্যাতন চালাচ্ছে। সরকার জিনজিয়াংয়ে গৃহীত বিভিন্ন নীতিকে সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও ধর্মীয় উগ্রবাদ প্রতিরোধ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বলে দাবী করছে। অন্যদিকে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক দপ্তর, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং একাধিক রাষ্ট্র এগুলোকে নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসাবে দেখছে। এই পরস্পর বিরোধী অবস্থান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিষয়টিকে আরও সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। প্রবন্ধটিতে এ সমস্ত বিষয় আলোচনা, পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর ও বিশ্লেষণধর্মী মূল্যায়ন উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

উইঘুর মুসলিমদের পরিচিতি

ঐতিহাসিকভাবে উইঘুরদের উৎপত্তি ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর তুর্কি যাবার জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত। ‘উইঘুর’ শব্দটি প্রাচীন তুর্কি ‘Uygur’ শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ ঐক্যবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ।^২ উইঘুরদের ইতিহাস প্রায় ১,৩০০ বছরেরও

বেশী পুরোনো।^৩ তারা অষ্টম শতকে উইঘুর খাগানাত (৭৪৪-৮৪০) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মধ্য এশিয়ার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়।^৪ বর্তমানে উইঘুরদের প্রধান আবাসভূমি চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত জিনজিয়াং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, যা ঐতিহাসিকভাবে পূর্ব তুর্কিস্তান নামে পরিচিত ছিল।^৫ জিনজিয়াং প্রদেশের জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ। এর মধ্যে মুসলমান প্রায় ১ কোটি ২৬ লাখ, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৮ শতাংশ।^৬ তাদের মাতৃভাষা উইঘুর, যা তুর্কি ভাষাপরিবারের কারলুক (Karluk) শাখাভুক্ত এবং আরবী-ভিত্তিক লিপিতে লিখিত হয়। অধিকাংশ উইঘুর সুনী মুসলিম।^৭ উইঘুরদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ধর্মীয় পরিচয় রয়েছে, যা তাদেরকে চীনের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র করেছে। বর্তমানে বিশ্বে উইঘুর জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ থেকে ১ কোটি ৫০ লাখ।^৮

উইঘুরদের জাতিগত পরিচয়ের সঙ্গে ধর্মীয় পরিচয়ের গভীর সংযোগ রয়েছে।^৯ সিআইএ (CIA)-এর *The World Factbook* অনুযায়ী, চীনের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২ শতাংশ মুসলিম।^{১০} মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুসলিমরা চীনা জনসংখ্যার ১.৮০ শতাংশ।^{১১} বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও এদেরকে উইঘুর না বলে বিভিন্ন দেশে তুর্কি, কাশগরী, খাতামি, ইয়ারকান্দি ইত্যাদি নামে ডাকা হ’ত।^{১২} মূলত, ১৯২১ সালে উজবেকিস্তানের তাসখন্দ সম্মেলনে আধুনিক উইঘুর পরিচয়কে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্মেলনে বলা হয়, ‘তারিম অববাহিকার (বর্তমান জিনজিয়াং) তুর্কিভাষী মুসলিম জনগণের জন্য উইঘুর নামটিই হবে তাদের আধুনিক জাতিগত পরিচয়।’^{১৩} এর পূর্বে তারা

৩. Michael C. Brose, “The Medieval Uyghurs of the 8th through 14th Centuries,” in *Oxford Research Encyclopedia of Asian History* (Oxford University Press, 2017), pp. 1–3.

৪. Gardner Bovingdon, *The Uyghurs: Strangers in their Own Land* (New York: Columbia University Press, 2010), pp. 1–6.

৫. Johan Elverskog, *Islam and the Silk Road: A History of the Muslims in Central Eurasia* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010), pp. 95–103.

৬. প্রথম আলো ০৪ ডিসেম্বর, ২০১৮।

৭. James A. Millward, *Op. cit.*, pp. 14–18.

৮. Roberts, Sean R. *The War on the Uyghurs: China's Internal Campaign against a Muslim Minority* (Princeton: Princeton University Press, 2020), pp. 15–18।

৯. Gardner Bovingdon, *Op. cit.*, pp. 22–34.

১০. Central Intelligence Agency, *The World Factbook: China* (Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2021), “People and Society – Religions” section.

১১. U.S. Department of State, *2023 Report on International Religious Freedom: China* (Washington, DC: U.S. Department of State, 2024), Section I: Religious Demography.

১২. Benson, Linda. *The Ili Rebellion: The Moslem Challenge to Chinese Authority in Xinjiang, 1944–1949* (Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1990) pp. 10–12.

১৩. *Ibid* pp. 10–12.

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ।

১. Muhammad al-Tahir ibn Ashur, *The objectives of Islamic Law (Maqasid al-shariah al-Islamiyyah)*, Translated by El-Mesawi (London: The International Institute of Islamic thought, 2006), pp. 171–180.

২. James A. Millward, *Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang* (New York: Columbia University Press, 2007), p. 44.

সাধারণত ‘তুর্কি’ অথবা আঞ্চলিক পরিচয়ে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে ১৯৩০-এর দশকে জিনজিয়াং প্রশাসন ‘উইঘুর’ নামটি সরকারী নথিতে ব্যবহার শুরু করে এবং ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার পর এটিকে স্বীকৃত জাতিগত পরিচয় হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে।^{১৪}

জিনজিয়াং অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব :

জিনজিয়াং চীনের প্রশাসনিক বিভাগগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। এর আয়তন প্রায় ১,৬৪৬,৪০০ বর্গকিলোমিটার, যা চীনের মোট ভূখণ্ডের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ।^{১৫} জিনজিয়াং প্রাচীন ঐতিহাসিক সিল্ক রোডের পাশে মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত হওয়ায় চীন ও মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জ্ঞানের আদান-প্রদান হয়। এই ভৌগোলিক অবস্থান জিনজিয়াংকে মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে পরিণত করেছে।^{১৬} বর্তমানেও অঞ্চলটি চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI)-এর অন্যতম প্রবেশদ্বার হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।^{১৭} অর্থনৈতিক দিক থেকেও জিনজিয়াং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জিনজিয়াং বহু জাতিগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির আবাসস্থল, যেখানে উইঘুর, কাজাখ, কিরগিজ, হুই ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী বসবাস করে। এই জাতিগত ও ধর্মীয় বৈচিত্র্য অঞ্চলটিকে সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ করেছে। একই সাথে অঞ্চলটি নিরাপত্তা, জাতিগত সম্পর্ক, মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ফলে জিনজিয়াং আজ কেবল চীনের একটি সীমান্ত অঞ্চল নয়; বরং এটি এশিয়ার ভূরাজনীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তা আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

উইঘুরদের ইসলাম গ্রহণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া :

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উইঘুরদের মধ্যে টেংরিবাদ, মানিকীয়, বৌদ্ধধর্ম এবং নেস্টোরীয় খ্রিস্টধর্মের প্রচলন ছিল। অজ্ঞাতনামা ফারসী লেখক রচিত *Hudūd al-Ālam* (৯৮২-৯৮৩) মধ্য এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন ভূগোলভিত্তিক গ্রন্থে উইঘুরদের (তোগুজ-ওঘুজ/উইঘুর) একটি সংগঠিত ও নগরভিত্তিক তুর্কি জনগোষ্ঠী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।^{১৮}

অষ্টম শতকে প্রতিষ্ঠিত উইঘুর খাগানাতে মানিকীয় ধর্ম রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। বৌদ্ধ ও মানিকীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রভাব তাদের সমাজে বিদ্যমান ছিল। এ সময় আরব মুসলিম বণিক, ছুফী সাধক এবং মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে উইঘুরদের যোগাযোগ শুরু হয়। ঐতিহাসিক সিল্ক রোড ছিল যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। মুসলিম বণিকদের বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং প্রচারকদের ধর্মীয় কার্যক্রমের ফলে ইসলাম ধীরে ধীরে জিনজিয়াং অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে।

উইঘুরদের ইসলাম গ্রহণের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় দশম শতাব্দীতে কারাখানীয় (৮৪০-১২১২) রাষ্ট্রের উত্থান। কারাখানীয় শাসক সুলতান সাতুগ বুগরা খান (৯২০-৯৫৫) ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে এশিয়ায় ইসলামের দ্রুত বিস্তার ঘটে। তাঁর ইসলাম গ্রহণ মধ্য এশিয়ার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরসূরীরা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফলে কাশগর, ইয়ারকান্দ, খোটান এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলাম দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং ধীরে ধীরে উইঘুর জনগোষ্ঠীর প্রধান ধর্মে পরিণত হয়।^{১৯} তাদের ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, আইন, সামাজিক রীতিনীতি এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ে ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।^{২০} মসজিদ, মাদ্রাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বিস্তৃত হয়। উল্লেখ্য, সমগ্র চীনে ৪০ হাজার মসজিদের মধ্যে জিনজিয়াং অঞ্চলেই রয়েছে ২৪,৪০০ মসজিদ।^{২১} আরবী ও ফারসী ভাষার সাহিত্য এবং ইসলামী জ্ঞানচর্চা তুর্কি ভাষার সঙ্গে মিশে নতুন সাংস্কৃতিক ধারার সৃষ্টি করে। এই সময়ে ইসলামী সভ্যতা ও তুর্কি ঐতিহ্যের সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র উইঘুর মুসলিম সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।^{২২}

উইঘুরদের ইসলাম গ্রহণ কয়েক শতাব্দীব্যাপী ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ফল। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য, আরব মুসলিম বণিক, ছুফী সাধকদের প্রচার এবং স্থানীয় সমাজের সাংস্কৃতিক অভিযোজন-সবগুলো উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।^{২৩} বর্তমান জিনজিয়াং অঞ্চলে উইঘুর মুসলিমদের ধর্মীয় পরিচয় এই দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল। ইসলাম কেবল তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসই নয়, বরং ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, আইন, সামাজিক রীতি এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়েরও একটি মৌলিক ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে।

১৪. *Ibid* pp. 10–12.

১৫. Stanley W. Toops, *The Geography of Xinjiang* (London: Routledge, 2004), pp. 1–2.

১৬. S. Frederick Starr, ed., *Xinjiang: China's Muslim Borderland* (Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2004), 5–12; Michael Dillon, *Xinjiang and the Expansion of Chinese Communist Power: Kashgar in the Early Twentieth Century* (London: Routledge, 2014), pp. 1–5.

১৭. Peter Frankopan, *The Silk Roads: A New History of the World* (London: Bloomsbury Publishing, 2015), 36–44; Michael Clarke, *Xinjiang and China's Rise in Central Asia: A History* (London: Routledge, 2011), 148–160.

১৮. Vladimir Minorsky (trans.), *Hudūd al-Ālam: The Regions of the World, A Persian Geography, 372 A.H.–982 A.D.*, 2nd ed. (London: Luzac, 1970), pp. 95–100.

১৯. James A. Millward, *Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang* (New York: Columbia University Press, 2007), pp. 58–66.

২০. Gardner Bovingdon, *Op. cit.*, pp. 22–31.

২১. The State Council Information Office of the People's Republic of China, *Freedom of Religious Belief in Xinjiang* (Beijing: State Council Information Office, 2016), sec. III, “Satisfying Believers’ Normal Religious Requirements.”

২২. Rian Thum, *The Sacred Routes of Uyghur History* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014), pp. 21–35.

২৩. Gardner Bovingdon, *Op. cit.*, pp. 18–28.

মাধু বা কিং সম্রাট কিয়ানলং-এর নেতৃত্বে (১৭৫৫-১৭৫৯) সমগ্র জিনজিয়াং অঞ্চল কিং বা মাধু রাজবংশের নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর থেকে অঞ্চলটির উপর চীনা শাসনের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ইয়াকুব বেগ ১৮৬৫ সালে কাশগড় দখল করে ধীরে ধীরে Seven Cities নামে পরিচিত একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, যা ১৮৭৭ সালে কিং সাম্রাজ্যের পুনর্দখলের মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়।^{২৪} ১৮৮৪ সালে চীনের কিং রাজবংশের সাথে দীর্ঘ ৮ বছর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীনতা হারায় পূর্ব তুর্কিস্তান। এর পরই অঞ্চলটির নামকরণ করা হয় জিনজিয়াং।^{২৫} ১৯১১ সালে কিং সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হওয়ার পর ১৯৩৩-৩৪ সালে দু'বার স্বাধীনতা লাভ করে উইঘুররা। এ সময় 'পূর্ব তুর্কিস্তান রিপাবলিক' নামে একটি স্বাধীন দেশ গঠন করা হয়। ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর বামপন্থী সেনাদের অভিযানে আবারও স্বাধীনতা হারায় উইঘুররা।^{২৬} বিশ শতকের প্রথমার্ধে দু'বার প্রথম পূর্ব তুর্কিস্তান প্রজাতন্ত্র (১৯৩৩-১৯৩৪) এবং দ্বিতীয় পূর্ব তুর্কিস্তান প্রজাতন্ত্র (১৯৪৪-১৯৪৯) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসার পর জিনজিয়াং গণপ্রজাতন্ত্র চীনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৫৫ সালে অঞ্চলটিকে জিনজিয়াং উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়।^{২৭} মূলত ঐতিহাসিক জিনজিয়াং ইস্যু প্রায় ২৬৭ (১৭৫৯-২০২৬) বছরের পুরোনো।^{২৮}

জিনজিয়াং সংকটের কারণ :

চীন সরকার ১৯৯০-এর দশক থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদ, সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্রমশ কঠোর করতে থাকে। বিশেষ করে ২০১৭ সাল থেকে উইঘুর মুসলিমদের ব্যাপক আটক, নয়রদারী, এবং তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হ'লে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। জাতিসংঘ, বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এবং বহু পশ্চিমা দেশ এসব বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে। উইঘুরদের সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস ১৯৪৯ সাল থেকে শুরু হলেও বর্তমান আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংকটটি মূলত ২০১৭ সাল থেকে রূপ নিয়েছে। সমসাময়িক বিশ্বের অন্যতম আলোচিত এই সংকটটি ইতিহাস, জাতিগত পরিচয়, রাষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক জটিল বাস্তবতা।

ঐতিহাসিক ও জাতিগত পরিচয়ের প্রশ্ন জিনজিয়াং সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ। উইঘুররা ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের দিক থেকে মধ্য এশিয়ার তুর্কি মুসলিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে

ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই স্বতন্ত্র পরিচয় সংরক্ষণের আকাঙ্ক্ষা এবং চীনা রাষ্ট্রের জাতীয় একীকরণ নীতির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে টানাপোড়েন বিদ্যমান।^{২৯} নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদবিরোধী নীতি সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে। ২০০৯ সালের উরুমচি দাঙ্গা এবং পরবর্তী কয়েকটি সহিংস ঘটনার পর চীন সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও ধর্মীয় উগ্রবাদ দমনের নামে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। চীনা সরকারের মতে, এসব ব্যবস্থা সামাজিক স্থিতিশীলতা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। এই নীতির প্রয়োগ সাধারণ উইঘুর জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকারকে সীমিত করেছে।^{৩০} ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ সংকটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ধর্মীয় শিক্ষা, মসজিদ পরিচালনা, ধর্মীয় পোষাক, ভাষা শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক চর্চার ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ উইঘুর জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি করেছে। সাংস্কৃতিক সমন্বয় নীতি সামাজিক দূরত্ব ও অবিশ্বাসকে আরও গভীর করেছে।^{৩১} অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনসংখ্যাগত পরিবর্তন নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। জিনজিয়াংয়ে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিনিয়োগ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ালেও এর সুফল সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হয়নি। পাশাপাশি হান জনগোষ্ঠীর অভিবাসন ও জনসংখ্যাগত পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে।^{৩২} এছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও মানবাধিকার প্রশ্ন জিনজিয়াং সংকটকে বৈশ্বিক ইস্যুতে পরিণত করেছে। জাতিসংঘ, বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এবং একাধিক পশ্চিমা রাষ্ট্র চীনের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উত্থাপন করেছে। কিন্তু চীন এসব অভিযোগকে খোড়াই কেয়ার করেছে। বরং জিনজিয়াং সংকট বর্তমানে নিরাপত্তা, মানবাধিকার এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির সংযোগস্থলে অবস্থান করেছে।^{৩৩}

উইঘুর মুসলিম নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন :

জিনজিয়াংয়ে উইঘুর মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন ও মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে উইঘুর মুসলিম, প্রবাসী উইঘুর সম্প্রদায়, সাবেক আটক ব্যক্তি, তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও গণমাধ্যম থেকে লোমহর্ষক বিবরণ পাওয়া গেছে। চীন সরকারের সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রবাদবিরোধী নীতির আড়ালে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত পরিচয়ের উপর

২৯. Ibid, pp. 23–58.

৩০. Sean R. Roberts, *The War on the Uyghurs: China's Internal Campaign against a Muslim Minority* (Princeton: Princeton University Press, 2020), pp. 41–69.

৩১. Michael Clarke, *Xinjiang and China's Rise in Central Asia: A History* (London: Routledge, 2011), pp. 170–178.

৩২. S. Frederick Starr, ed., *Xinjiang: China's Muslim Borderland* (Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2004), pp. 319–338.

৩৩. OHCHR, *Assessment of Human Rights Concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region*, pp. 1–4.

২৪. James A. Millward, *Op. cit.*, pp. 112–120.

২৫. কালবেলা, ১৩ নভেম্বর, ২০২৩।

২৬. কালবেলা, ১৩ নভেম্বর, ২০২৩।

২৭. Gardner Bovingdon, *Op. cit.*, pp. 54–71.

২৮. Laura J. Newby, *The Empire and the Khanate: A Political History of King Relations with Khaqand C. 1760-1860* (Leiden: Brill, 2005), pp. 19-28,

ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ১৯৪৯ সালে চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কিছুদিন পর কমিউনিস্ট সরকার উইঘুরদের বৃহত্তর চীনের সাথে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব করে। প্রস্তাব না মানায় উইঘুরদের উপর গুরু হয় নির্যাতন।^{৩৪} বিশেষ করে ২০১৭ সালের পর থেকে বিপুল সংখ্যক উইঘুর মুসলিমকে বিচার ছাড়াই আটক রাখা হয়েছে, ধর্মীয় অনুশীলনে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে এবং পরিবার বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা অহরহ ঘটছে।^{৩৫} ASPI-এর ২০২০ সালের স্যাটেলাইট বিশ্লেষণে জিনজিয়াংয়ে ৩৮০-এর অধিক সন্দেহভাজন আটককেন্দ্র ও কারাগারের অস্তিত্বের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।^{৩৬} মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ৩০ লাখের বেশী মুসলিমকে বন্দীশালায় বন্দী করে রেখেছে চীন সরকার। এসব বন্দীদের উপর চলছে নানা নির্যাতন।^{৩৭} হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে, মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বিদেশে কারো সাথে যোগাযোগ করলে তাদেরকে টার্গেট করে সরকার।^{৩৮} সার্বক্ষণিক কঠোর নয়রদারীর মধ্যে রাখা হয়েছে উইঘুর মুসলিমদের। বিবিসি সংবাদদাতা জিনজিয়াং এলাকায় গিয়ে দেখেছেন যে, সরকারী কর্মকর্তারা উইঘুর মুসলিমদের মোবাইল পরীক্ষা করে দেখছে।^{৩৯}

উইঘুর মুসলিমদের বুলিয়ে পেটানো হয়; তার দিয়ে চাবুক তৈরি করে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়; প্লাইয়ার দিয়ে হাত পায়ে নখ তুলে ফেলা হয়। রামায়ান মাসে জোর করে মুসলিমদের খাওয়ানো হয় এবং দিনের বেলায় রেস্টুরেন্ট খোলা রাখতে বাধ্য করা হয়। জোর করে দাড়ি শেভ করে দেওয়া হয়। হিজাব পরায় জারী করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। ওয়াল্ট উইগুর কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ডলকুন ঈশা বলেন, ‘চীন যা করছে তা আমাদের জন্য অনেক কষ্টদায়ক, অপমানজনক’।^{৪০} এ সমস্ত নির্যাতনকে মানবতার জন্য লজ্জাজনক বলে আখ্যা দিয়েছে তুরস্ক। ২০১৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী তুরস্ক সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে চীনের জিনজিয়াং নীতির সমালোচনা করে এবং উইঘুরদের প্রতি চীনের

আচরণকে মানবতার জন্য এক বড় লজ্জা বলে অবিহিত করে। তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র Hami Aksoy দাবী করেন যে, এক মিলিয়নের বেশী উইঘুরকে নির্বিচারে আটক রাখা হয়েছে এবং তাদের উপর রাজনৈতিক মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়া ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তুরস্ক চীনের কাছে এসব আটককেন্দ্র বন্ধ করার আবেদন জানায় এবং জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিষয়টি নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানায়।^{৪১}

স্বাস্থ্য সেবার নামে গিনিপিগ বানিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হয়। অজ্ঞাত ড্রাগ ও ইনজেকশন দিয়ে মানসিকভাবে রোগগ্রস্ত করে দেওয়া হয়। মসজিদের গম্বুজ, মিনার ধ্বংস করা হচ্ছে। সন্তান জন্মদান আইন ভঙ্গের অযুহাতে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে নির্যাতন করা হয়। উইঘুর শিশুদের ‘মুহাম্মাদ’ বা ‘মদীনা’ নাম রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।^{৪২} কেরোজিনসা মামানোতি ক্যাম্প থেকে ফিরে এসে সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তার নিজের বোন পাতেম (৩৪)-এর সাথে এমন আচরণ করা হয়েছে।^{৪৩} দুইয়ের অধিক সন্তান থাকলেই দিতে হয় মোটা অংকের অর্থ; করতে হয় কারাভোগ। উইঘুর মুসলিমদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জোর পূর্বক গর্ভপাত ও বন্ধ্যাকরণ করা হয়।^{৪৪} পিতা-মাতাকে বন্দিশিবিরে আটক রেখে শিশুদের রাষ্ট্র পরিচালিত ইয়াতীমখানায় রেখে পরিবার বিচ্ছেদের মত ঘটনা ঘটানো হয়। হিজাব পরা কিংবা দাড়ি রাখার কারণেও বন্দিশিবিরে আটক রাখা হয়। বন্দিশিবিরে চীনের মাভারিন ভাষা শিখতে বাধ্য করা হয়।^{৪৫} ইলেকট্রিক শক দিয়ে জ্ঞান হত্যা করা হয়। অতিরিক্ত সন্তানের খোঁজে বাসাবাড়িতে অভিযান চালানো হয়। ভয়ে শিশুদের লুকিয়ে রাখে আতঙ্কিত মায়েরা। স্টেরিলাইজেশন, কারাগারে আটক রাখা, স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে শেষ করা হচ্ছে। হান জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে উইঘুরদের সংখ্যা লঘু করা হচ্ছে। ১৯৪৯ সালের পূর্বে জিনজিয়াংয়ে ৯৫ শতাংশ উইঘুর বসবাস করত। ১৯৮০ সালে তা ৫৫ শতাংশে নেমে আসে। বর্তমানে নিজ ভূখণ্ডে উইঘুরদের হার প্রায় ৪৬ শতাংশ।^{৪৬} উইঘুরের হোতান ও কাশগারে ২০১৫ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে জন্মহার কমেছে ৬০ শতাংশ। কিন্তু চীনের অন্যান্য জায়গায় এ হার কমেছে মাত্র ৪ শতাংশ। এটি জনমিতি গণহত্যা।^{৪৭}

উইঘুরদের কবিতা লেখা বা সাহিত্য চর্চার অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। চীনে কারাবন্দী লেখকের সংখ্যা ১০০

৩৪. ঢাকা টাইমস, ৭ অক্টোবর, ২০২০।

৩৫. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Assessment of Human Rights Concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China (Geneva: United Nations, 2022), pp. 5–7, 16–23; Amnesty International, Like We Were Enemies in a War: China's Mass Internment, Torture and Persecution of Muslims in Xinjiang (London: Amnesty International, 2021), pp. 17–28, 44–59.

৩৬. Australian Strategic Policy Institute, Uyghurs for sale: Re-Education, Forced Labour and Surveillance Beyond Xinjiang Canberra: ASPI 2020.

৩৭. ঢাকা টাইমস, ৭ অক্টোবর, ২০২০।

৩৮. বিবিসি, ১ অক্টোবর, ২০১৮।

৩৯. John Sudworth and BBC Visual Journalism Team, “Xinjiang Police Files: Inside a Chinese Internment Camp,” BBC News, May 24, 2022.

৪০. ইত্তেফাক, ২৯ মে, ২০১৯।

৪১. euronews.com, published February 10, 2019

৪২. ঢাকা টাইমস, ৭ অক্টোবর, ২০২০।

৪৩. দি ডেইলি স্টার, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২০।

৪৪. যমুনা নিউজ, ২৯ জুন, ২০২০।

৪৫. বিবিসি, ১ অক্টোবর, ২০১৮।

৪৬. কালবেলা, ১৩ নভেম্বর, ২০২৩।

৪৭. সময় নিউজ, ৩০ জুন ২০২০।

ছাড়িয়ে গেছে। শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।^{৪৮} জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত বৈঠকে জিনজিয়াংয়ে উইঘুর মুসলমানদের উপর চীন সরকারের নির্যাতনের নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে ৩৯টি দেশ।^{৪৯} সেখানে নতুন মসজিদ নির্মাণের অনুমতি মিলছে না। যুবকদের বৌদ্ধ মেয়েদের বিয়ে করতে বাধ্য করা হচ্ছে। ২০১৬ সালে ‘মেকিং ফ্যামিলি’ নামের একটি উদ্যোগ চালু করে চীন। এর মাধ্যমে উইঘুর পরিবারকে প্রতি দুই মাসে কমপক্ষে পাঁচ দিনের জন্য তাদের ঘরে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যদের হোস্ট করতে এবং চীনা হান পুরুষদের সাথে উইঘুর মুসলিম পরিবারের নারীদেরকে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করা হয়।^{৫০}

জাতিসংঘ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় ১০ লাখ উইঘুরকে চীনের কথিত ‘সন্ত্রাসবাদ’ কেন্দ্রগুলোতে আটক রাখা হয়েছে। ২০ লাখ মানুষকে ‘রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক পুনর্বিবেচনার শিবিরে’ অবস্থান করতে বাধ্য করা হয়েছে।^{৫১} অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলছে ২০০৯ সালের দাঙ্গার পর শান্তিপূর্ণ মত প্রকাশের দায়ে চীন সরকার গোপনে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের বিচার করে। ধর্ম নিয়ন্ত্রণ ও সংখ্যালঘুদের ভাষা শিক্ষা নিষিদ্ধ করে চীন সরকার। কমিউনিষ্ট পার্টির প্রশংসার কথা বলা এবং তাদের সঠিক আচরণ পরিচালনার নিয়মগুলো কঠোরভাবে মনে রাখতে বাধ্য করা হয়। শিক্ষা শিবিরে পাঠানোর নামে লাখে বিশিষ্ট উইঘুর ব্যক্তিত্বকে আটক বা গুম করা হয়েছে। এদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষাবিদ মোহাম্মাদ ছালিহ হাজিম, অর্থনীতিবিদ ইলহাস তোকতি, নৃতাত্ত্বিক রাহাইল দাউদ, পপশিল্পী আব্দুর রহীম হায়াত, ফুটবলার এরফান হিজামি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।^{৫২} বন্দীশিবিরে আটক ব্যক্তিদের উপর মাসিক ও শারীরিক নির্যাতন, জোর পূর্বক শ্রম এবং শূকরের গোশত খেতে বাধ্য করার মত ঘটনা ঘটেছে।^{৫৩}

জিনজিয়াংয়ে বিশ্বের অন্যতম বিস্তৃত ডিজিটাল নয়রদারী ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ, বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ, ডিএনএ ও আইরিস স্ক্যান, মোবাইল ফোন পর্যবেক্ষণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (AI) নিরাপত্তা বিশ্লেষণ ইত্যাদি।^{৫৪} আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসি, রয়টার্স, দি নিউইয়র্ক টাইমস, দি গার্ডিয়ান এবং অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে স্যাটেলাইট চিত্র, সরকারী নথি, ফাঁস হওয়া দলীল এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আটককেন্দ্র, নয়রদারী ব্যবস্থা এবং শ্রম

স্থানান্তর কর্মসূচী নিয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।^{৫৫} মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা, মিডিয়া নেটওয়ার্ক, মিডিলিস্ট আই এবং আরব নিউজ-এর প্রতিবেদনে উইঘুর মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা, মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষা, রামাযান ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুশীলনের ওপর বিধিনিষেধ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে এসব প্রতিবেদনে মুসলিম বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের নীরবতা বা সীমিত প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিও আলোচিত হচ্ছে। উইঘুর সংগঠন *World Uyghur Congress*-এর মতে, জিনজিয়াংয়ে চীনা সরকার উইঘুরদের ধর্মীয় স্বাধীনতা, ভাষা, সংস্কৃতি ও মৌলিক মানবাধিকার পদ্ধতিগতভাবে দমন করছে। সংগঠনটির দাবী, ব্যাপক নজরদারী, নির্বিচার আটক, জোরপূর্বক শ্রম এবং সাংস্কৃতিক আত্মীকরণ নীতির মাধ্যমে উইঘুর পরিচয়কে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে। *WUC* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি স্বাধীন তদন্ত, জবাবদিহি এবং মানবাধিকার সুরক্ষার আহ্বান জানায়।^{৫৬} উইঘুর সংগঠন *UHRP* (Human Rights Project)-এর মতে, জিনজিয়াংয়ে মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সংগঠনটি তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, উইঘুরদের বিরুদ্ধে গণহত্যা, ধর্মীয় অনুশীলনে বাধা, জোরপূর্বক শ্রম, পরিবার বিচ্ছিন্নকরণ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংসের মতো কর্মকাণ্ডে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের পরিপন্থী।^{৫৭}

বর্তমান অবস্থা :

উইঘুর মুসলিমদের উপর কঠোর নয়রদারী, দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমস্থানান্তর কর্মসূচী নিয়ে এখনও গভীর উদ্বেগ রয়েছে।^{৫৮} সংখ্যালঘুদের উপর পদ্ধতিগত ও ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মানবাধিকার সংস্থাগুলো সাংস্কৃতিক গণহত্যা ও জোরপূর্বক আত্মীকরণের নীতি হিসাবে আখ্যায়িত করে আসছে। *Human Rights Watch*-এর গবেষণা অনুযায়ী, চীনা কর্তৃপক্ষ জিনজিয়াং অঞ্চলে প্রায় ৬৩০টি উইঘুর গ্রামের ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যপূর্ণ নাম পরিবর্তন করেছে। এতে বলা হয়েছে, এসব নাম পরিবর্তন উইঘুরদের ইতিহাস ধর্মীয় পরিচয় ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা মুছে ফেলার বৃহত্তর সরকারী প্রচেষ্টার অংশ বলে প্রতীয়মান হয়।^{৫৯} নির্দিষ্ট পোষাক পরা, ধর্মীয় নাম

৪৮. ইন্ডেফাক, ৩ মে, ২০২৪।

৪৯. ঢাকা টাইমস, ৭ অক্টোবর, ২০২০।

৫০. কালবেলা, ১৩ নভেম্বর, ২০২৩।

৫১. প্রথম আলো, ৪ ডিসেম্বর, ২০১৮।

৫২. প্রথম আলো, ৪ ডিসেম্বর, ২০১৮।

৫৩. আল জাজিরা, ২ জুলাই ২০২৬।

৫৪. Darren Byler, In the Camps: China's High-Tech Penal Colony (New York: Columbia Global Reports, 2021), pp. 52–66.

৫৫. Human Rights Watch, China's Algorithms of Repression: Reverse Engineering a Xinjiang Police Mass Surveillance App (New York: Human Rights Watch, 2019), pp. 16–27.

৫৬. World Uyghur Congress, About the Uyghurs, accessed July 13, 2026.

৫৭. Uyghur Human Rights Project, Annual Report, Washington, DC: UHRP, 2024.

৫৮. OHCHR Assessment of Human Rights Concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China. Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2022, pp. 1–4.

৫৯. Human Rights Watch, “China: Hundreds of Uyghur Village Names Change,” June 18, 2024.

ও ছিয়াম রাখার উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা এখনো বিদ্যমান। শত শত মসজিদ ধ্বংস বা ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। পুরো জিনজিয়াং অঞ্চলকে একটি সর্বাঙ্গিক পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে। মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ব্যাপক নয়রদারী অব্যাহত রয়েছে। উইঘুরদের ‘শ্রম স্থানান্তর’ কর্মসূচীর নামে বিভিন্ন কারখানায় জোরপূর্বক শ্রমে বাধ্য করা হচ্ছে।^{৬০}

চীনের বক্তব্য :

চীন সরকার বরাবরই সকল অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে আসছে। তারা বলছে, জিনজিয়াংয়ে গৃহীত পদক্ষেপের উদ্দেশ্য সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং ধর্মীয় উগ্রবাদ প্রতিরোধ, দারিদ্র্য হ্রাস এবং দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।^{৬১} অভিযোগকে চীন ভিত্তিহীন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলে বর্ণনা করে। চীন জাতিসংঘে বারবার বলেছে যে, জিনজিয়াংয়ে বর্তমানে সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সন্ত্রাসী হামলা বন্ধ হয়েছে এবং জনগণের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।^{৬২}

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া :

উইঘুর মুসলিম ইস্যুতে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া একমুখী নয়; বরং মানবাধিকার, জাতীয় নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক আইন, ভূরাজনীতি এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অবস্থান ভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি দেশ চীনের নীতির সমালোচনা করে নিষেধাজ্ঞা ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে, এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ জাতিসংঘে চীনের নীতির প্রতি সমর্থন বা নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছে। এই বিভক্ত অবস্থানের পেছনে মানবাধিকার মূল্যবোধের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সম্পর্ক, কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং আন্তর্জাতিক ক্ষমতার রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।^{৬৩} জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক দফতর, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো জিনজিয়াংয়ে উইঘুর মুসলিমদের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

২০২২ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় যে, জিনজিয়াংয়ে ইচ্ছামতো ও বৈষম্যমূলক আটক, নির্যাতন, জোরপূর্বক শ্রম, ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ এবং পরিবার বিচ্ছিন্নকরণের বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ রয়েছে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, এসব কর্মকাণ্ডের কিছু আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের পর্যায়ে পড়ে।^{৬৪}

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ‘হিউম্যান রাইটস ওয়াশ’ এবং ‘এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল’ উভয়ই অভিযোগ করেছে যে, জিনজিয়াংয়ে ব্যাপক গণআটক, জিজ্ঞাসাবাদ, ধর্মীয় অনুশীলনে বিধিনিষেধ, ডিজিটাল নয়রদারী এবং জোরপূর্বক শ্রমের নীতি অনুসৃত হয়েছে। তাদের মতে, এসব পদক্ষেপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।^{৬৫} যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানিসহ ৪৭টি দেশ যৌথ বিবৃতিতে উইঘুর নির্যাতনে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে।^{৬৬} কানাডা ও নেদারল্যান্ডের পার্লামেন্টে উইঘুর মুসলিমদের উপর চীনের পদক্ষেপকে গণহত্যা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাদের মতে, কোন জাতিকে তার বিশ্বাসের কারণে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।^{৬৭}

উইঘুর ইস্যুতে মুসলিম বিশ্বের অবস্থান :

জিনজিয়াংয়ের উইঘুর মুসলিম ইস্যুতে মুসলিম বিশ্বের অবস্থান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে বিভক্ত। তাদের প্রতিক্রিয়া বৈচিত্র্যময় এবং অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী। কয়েকটি মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র উইঘুর মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মানবাধিকার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র প্রকাশ্যে চীনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেনি। চীনের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও কৌশলগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI)-এর আওতায় চীনা বিনিয়োগ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ঋণনির্ভর সহযোগিতার কারণে অনেক রাষ্ট্র সতর্ক কূটনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেছে।^{৬৮}

২০১৯ সালে জাতিসংঘে একটি যৌথ চিঠিতে সউদী আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, পাকিস্তান, মিশরসহ বেশ কিছু

<https://www.hrw.org/news/2024/06/18/china-hundreds-uyghur-village-names-chang>

৬০. Human Rights Watch, “Eradicating Ideological Viruses”: China’s Campaign of Repression Against Xinjiang’s Muslims (New York: Human Rights Watch, 2018), 26–33.

৬১. The State Council Information Office of the People’s Republic of China, The Fight Against Terrorism and Extremism and Human Rights Protection in Xinjiang (Beijing: State Council Information Office, 2019), pp. 1–6.

৬২. The Fight against Terrorism and Extremism and Human Rights Protection in Xinjiang (Beijing: Foreign Languages Press, March 2019), pp. 1–5.

৬৩. Sean R. Roberts, The War on the Uyghurs: China’s Internal Campaign against a Muslim Minority (Princeton: Princeton University Press, 2020), pp. 214–232.

৬৪. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Assessment of Human Rights Concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People’s Republic of China (Geneva: OHCHR, 2022), pp. 1–4.

৬৫. Amnesty International, Like We Were Enemies in a War: China’s Mass Internment, Torture and Persecution of Muslims in Xinjiang (London: Amnesty International, 2021), pp. 9–21, 97–105.

৬৬. সময় নিউজ, ১৫ জুন, ২০২২।

৬৭. বিবিসি, ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২১।

৬৮. James Millward, “What It’s Like to Live in a Surveillance State,” The New York Review of Books, no. 3, 2018), pp. 65; Sean R. Roberts, The War on the Uyghurs: China’s Internal Campaign against a Muslim Minority (Princeton: Princeton University Press, 2020), pp. 214–232.

মুসলিম অধ্যুষিত দেশ চীনের জিনজিয়াং নীতির প্রতি সমর্থন জানায় এবং সম্ভ্রাসবাদ ও উগ্রবাদ দমনে চীনের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে।^{৬৯} পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের পর ঘোষণাপত্রে চীনের মুসলিম নাগরিকদের জন্য প্রদত্ত সেবার বিষয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করা হয়, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সমালোচনার মুখে পড়ে। মুসলিম বিশ্বের এই অবস্থানের পেছনে ভূ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা এবং পররাষ্ট্রনীতির অগ্রাধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করা হয়।^{৭০} মূলত উইঘুর মুসলিম ইস্যুতে মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়া ধর্মীয় সংহতির চেয়ে স্বার্থবাদী কূটনীতি দ্বারা অধিক প্রভাবিত। ফলে এ ইস্যুতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের পরিবর্তে ভিন্নমুখী ও স্বার্থনির্ভর নীতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উইঘুর সংকটের টেকসই সমাধানের নীতিগত সুপারিশ :

উইঘুর সংকটের টেকসই সমাধানের জন্য চীন সরকার, উইঘুর জনগোষ্ঠী, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে গঠনমূলক সংলাপ ও পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি, মানবাধিকার-সংক্রান্ত অভিযোগের স্বচ্ছ তদন্ত, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে বৈষম্য হ্রাস, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুরক্ষা এবং স্থানীয় জনগণের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে সংলাপ, কারিগরি সহযোগিতা এবং আস্থা-ভিত্তিক কূটনৈতিক উদ্যোগ জোরদার করা যরুরী। দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য নিরাপত্তা, উন্নয়ন, আইনের শাসন এবং মানবাধিকার-এই চারটি বিষয়ের মধ্যে একটি কার্যকর ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একই সাথে উভয় পক্ষকে সহনশীল ও ন্যায্যসঙ্গত আচরণ করতে হবে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। নিয়মিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পর্যালোচনা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে। গবেষণা ও তথ্যপ্রাপ্তির পর্যাপ্ত সুযোগ সম্প্রসারণ করতে হবে। ডিজিটাল নজরদারির জন্য আন্তর্জাতিক নৈতিক কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে। ডিজিটাল প্রমাণ সংরক্ষণ ও যাচাইয়ের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। জাতিসংঘের চুক্তিভিত্তিক সংস্থাগুলোর সুপারিশ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGS)-এর সঙ্গে মানবাধিকার নীতির সমন্বয় করতে হবে এবং মুসলিম বিশ্বকে

উইঘুর মুসলিমদের ন্যায্যসঙ্গত দাবীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে হবে। মূলত সমন্বিত উদ্যোগই উইঘুর সংকটের একটি টেকসই ও গ্রহণযোগ্য সমাধানের ভিত্তি হ'তে পারে।

উপসংহার

উইঘুর মুসলিমদের নির্যাতন ও মানবাধিকার সংকট সমসাময়িক বিশ্বের অন্যতম জটিল ও বিতর্কিত আন্তর্জাতিক ইস্যু। এর শিকড় কেবল সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং জিনজিয়াং অঞ্চলের দীর্ঘ ইতিহাস, উইঘুরদের স্বতন্ত্র জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয়, ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তানীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। একদিকে চীন সরকার সম্ভ্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও ধর্মীয় উগ্রবাদ প্রতিরোধের যুক্তিতে গৃহীত পদক্ষেপকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য অপরিহার্য বলে দাবী করে। অন্যদিকে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক দফতর, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা, গণমাধ্যম এবং বহু রাষ্ট্র নির্বিচার আটক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ, জোরপূর্বক শ্রম, ব্যাপক নয়রদারী ও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতাসহ বিভিন্ন অভিযোগে গভীর উদ্বেগ জানাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়াও অর্থনৈতিক, কৌশলগত ও কূটনৈতিক কারণে বিভক্ত। ফলে জিনজিয়াং সংকট আজ কেবল একটি আঞ্চলিক বা দ্বিপাক্ষীয় বিষয় নয়; বরং এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সংখ্যালঘু অধিকার এবং বৈশ্বিক কূটনীতির সংযোগস্থলে অবস্থান করছে। অতএব এই সংকটের টেকসই ও গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য মানবাধিকার সুরক্ষা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা, সম্ভ্রাসবাদ দমনে আন্তর্জাতিক আইনের নীতি অনুসরণ, পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি এবং গঠনমূলক সংলাপের পরিবেশ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

দারুস সুন্নাহ শপ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সকল প্রকার ইসলামী বই, তাফসীর ও হাদীছ গ্রন্থ, হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, আহলেহাদীস তা'লিমী বোর্ড ও কওমী মাদ্রাসার বই-পুস্তক এবং দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, খেজুর, খাঁটি মধু, ঘি, কালোজিরার তেল, জয়তুন তেল, অন্যান্য খাঁটি ও অর্গানিক পণ্য সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

যোগাযোগ করুন :



০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪৯-৮১১৩৪৪

অর্ডার করতে ভিজিট করুন : Darus Sunnah Shop

সেন্ট্রাল রোড, আল-মানার ডবল
(নিচ তলা), হাজী লেন, রংপুর।

৬৯. United Nations Human Rights Council, "Letter Dated 12 July 2019 from Ambassadors to the President of the Human Rights Council," 2019.

৭০. Organisation of Islamic Cooperation, Final Communiqué of the 46th Session of the Council of Foreign Ministers (Abu Dhabi: 2019), paras. 183–184; Michael Clarke, *Xinjiang and China's Rise in Central Asia: A History* (London: Routledge, 2011), pp. 170–178.

নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা : পরকালীন জীবনের অনন্য পাথেয়

-আব্দুল্লাহ আল-মারুফ*

ভূমিকা :

প্রতিযোগিতা মানব স্বভাবের এক সহজাত বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর এই বিশাল রঙ্গমঞ্চে আমরা প্রতিনিয়ত কত কিছুর পেছনেই না মরিয়া হয়ে ছুটছি! একজন উদ্যোক্তা চাইছেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানকে টপকে বাজারের শীর্ষস্থান দখল করতে, একজন স্বপ্নবাজ ছাত্র চাইছে সহপাঠীদের পেছনে ফেলে সর্বোচ্চ ফলাফল নিজের বুলিতে পুরতে। একজন পেশাজীবী দিন-রাত এক করে ফেলছেন কাক্ষিত পদোন্নতির আশায়, আবার একজন গৃহিণী হয়তো চাইছেন অন্যের চেয়ে নিজের সংসারটিকে আরেকটু বেশী জাঁকজমকপূর্ণ করে সাজাতে। পার্থিব এই প্রতিযোগিতার যেন কোন শেষ নেই। ক্ষণভঙ্গুর এই দুনিয়ার পেছনে অন্তহীন ছুটে চলার এই দৌড় দিনশেষে একবুক ক্লান্তি আর শূন্যতা ছাড়া আমাদের আর কিছুই দেয় না। অথচ একজন মুমিনের ভাবনার দিগন্ত কেবল এই ক্ষুদ্র দুনিয়াতে সীমাবদ্ধ নয়; তাঁর বুকের গহীনে লুক্কায়িত থাকে অনন্ত আখেরাতের এক বিশাল ক্যানভাস। ইসলাম মানব মনের এই সহজাত প্রতিযোগিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে আখেরাতমুখী করতে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হ'তে উৎসাহিত করে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমরা সেই প্রতিযোগিতার স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

১. নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা বলতে কি বুঝায় :

নেকীর কাজে প্রতিযোগিতার অর্থ হ'ল সর্বদা নেক আমল সম্পাদনে তৎপর থাকা, ভালো কাজের সুযোগ উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে কালক্ষেপণ না করে লুফে নেওয়া এবং আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অন্যকে প্রতিনিয়ত ছাড়িয়ে যাওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো। সুতরাং নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা কেবল অন্য মানুষের সাথে পাল্লা দেওয়ার নাম নয়; বরং এর সিংহভাগই হ'ল নিজের ভেতরের কুপ্রবৃত্তি ও অলস নফসের সাথে এক অবিরাম লড়াই। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে নেক আমলে এই প্রতিযোগিতা ও অগ্রগমিতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য মূলত ৫টি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে- (১) আল-মুনাফাসা (المُنَافَسَةُ), (২) আল-মুসাঝাক্বাহ (المُضَاهَاةُ), (৩) আল-মুসার'আহ (المُسَارَعَةُ), (৪) আল-ইস্তিবাক্ব (الإِسْتِيقَاءُ) এবং (৫) আল-মুবাডারাহ (المُبَادَرَةُ)। নিম্নে এই পরিভাষাগুলোর পরিচয় বিস্তারিত তুলে ধরা হ'ল।

১. আল-মুনাফাসা (المُنَافَسَةُ) :

'আল-মুনাফাসাহ' শব্দটির মূল ব্যুৎপত্তি এমন এক অভ্যন্তরীণ

অনুভূতির দিকে ইঙ্গিত করে, যা মানুষকে অত্যন্ত মূল্যবান ও মর্যাদাপূর্ণ জিনিস পাওয়ার জন্য ব্যাকুল করে তোলে। ভাষাবিদ ও মুহাদ্দিহ আবু আব্দুল্লাহ আল-হুমাইদী (মৃ. ৪৮৮ হি./১০৯৫ খ্রি.) বলেন, الرِّغْبَةُ فِي الشَّيْءِ وَالْحِرْصُ 'আল-মুনাফাসাহ হ'ল- কোন বিষয়ের প্রতি গভীর আগ্রহ ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা'।^১ আবু সুলায়মান আল-খাত্তাবী (৩১৮-৩৮৮ হি./৯৩০-৯৯৮ খ্রি.) বলেন, شِدَّةُ الرِّغْبَةِ 'প্রবল আগ্রহ বা তীব্র আকাঙ্ক্ষা'।^২

অর্থাৎ যখন আল্লাহর নৈকট্য অর্জন এবং জান্নাতের মেহমান হওয়ার জন্য বান্দার অন্তরে এক তীব্র ব্যাকুলতা তৈরি হয়, সেটিই হ'ল আল-মুনাফাসা। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرْزَاقِ يُنْظَرُونَ، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ، يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ، خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ 'নিশ্চয়ই নেককারগণ থাকবে জান্নাতে। উচ্চাসনে বসে তারা অবলোকন করবে। তুমি তাদের চেহারা সমূহে দেখবে স্বাচ্ছন্দ্যের প্রফুল্লতা। তাদেরকে পান করানো হবে মোহরাংকিত বিশুদ্ধ পানীয়। যার মোহর হবে মিশকের। আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত' (মুত়াফফিহীন-মাক্কী ৮৩/২২-২৬)। অত্র আয়াতের তাফসীরে মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন ক্বাসেমী (১২৮৩-১৩৩২ হি./১৮৬৬-১৯১৪ খ্রি.) বলেন، فَلْيَرْغَبِ الرَّاعِبُونَ بِالْإِسْتِيقَاءِ 'অতএব আগ্রহীদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের পানে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করা'।^৩

এই প্রতিযোগিতার সবচেয়ে সৌন্দর্যময় দিক হ'ল পার্থিব প্রতিযোগিতার মতো এতে অন্যের প্রতি কোন হিংসা, ক্ষতিসাধন বা শত্রুতার স্থান নেই। ইমাম রাগেব আল-ইছফাহানী (মৃ. ৫০২ হি./১১০৮ খ্রি.) বলেন، وَالْمُنَافَسَةُ: مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ لِلتَّشْبِيهِ بِالْأَفْضَلِ، وَاللُّحُوقُ بِهِمْ مِنْ غَيْرِ 'আল-মুনাফাসাহ (প্রতিযোগিতা) হ'ল অন্য কারো কোন ক্ষতিসাধন না করে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান

১. মুহাম্মাদ ইবনু ফুতুহ আল-হুমাইদী আল-আযদী, তাফসীর গারীবী মা ফিহ ছহীহাইন আল-বুখারী ওয়া মুসলিম, তাহক্কীক: ড. যুবাইদাহ মুহাম্মাদ সাদ্দ আল-আযীয (কায়রো: মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৮৮।
২. আবু সুলায়মান হামাদ আল-খাত্তাবী আল-বুতী, গারীবুল হাদীছ, তাহক্কীক: আব্দুল কারীম ইবরাহীম আল-গারবায়ী ও অন্যান্য (বেরুত: দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.), ২৩১।
৩. মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, মাহাসিনুত তা'বীল (তাফসীরুল ক্বাসিমী), তাহক্কীক: মুহাম্মাদ বাসিল উয়ুন আস-সুদ (বেরুত: দারুল কুতুবিল-ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.), ৯/৪৩৪।

*শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী।

ব্যক্তিদের সাদৃশ্য অর্জনে এবং তাঁদের সমকক্ষ হওয়ার উদ্দেশ্যে আত্মপ্রচেষ্টা চালানো।^৪

মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হি./১৯২৯-২০০১ খ্রি.) বলেন, الْمُنَافَسَةُ فِي الْخَيْرِ هِيَ الْمُسَابَقَةُ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى مَا يُرِضِي اللَّهَ سُبْحَانَهُ ‘কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা (আল-মুনাফাসাহ) হ’ল মহা পরাক্রমশালী ও সুমহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে এবং আল্লাহ সুবহানা হওয়া তা’আলার সন্তুষ্টির পানে দ্রুত অগ্রগামী হওয়া, আর আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে এমন যাবতীয় বিষয় থেকে দূরে থাকা’।^৫

সমাজ ও চারপাশের চাকচিক্য দেখে অনেক সময়ই আমরা নিজেকে ছোট মনে করি। কোন উদ্যোক্তা বন্ধু যখন ব্যবসায় সফল হয়ে নতুন মডেলের গাড়ি নিয়ে আমাদের কারো পাশ দিয়ে চলে যায়, তখন তার মনে হ’তে পারে- আমি হয়ত পিছিয়ে পড়লাম। কিন্তু না! তখন সেই বান্দার করণীয় হ’ল নেক আমলে তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। এ ব্যাপারে আইয়ুব সাখতিয়ানী (৬৮-১৩১ হি.) বলেন, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ ‘যখন তুমি কাউকে দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা করতে দেখবে, তখন তুমি তার সাথে আখেরাত নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে’।^৬ সুতরাং আপনার সহকর্মী হয়তো অনেক টাকা খরচ করে দামী রেস্টুরেন্টে খাচ্ছে, আপনি তখন মুছল্লায় দাঁড়িয়ে এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে একটি জান্নাতের ঘর চেয়ে নিন। আপনার দুনিয়াবী অর্জন হয়তো কম হ’তে পারে, কিন্তু আপনার অন্তরের এই ‘মুনাফাসা’ বা তীব্র ব্যাকুলতাই আপনাকে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় করে তুলতে পারে।

২. আল-মুসাঝাক্বা (المُسَابَقَةُ) :

‘মুসাঝাক্বাহ’ হ’ল ময়দানে ঘোড়দৌড়ের মতো দ্রুত গতিতে একে অপরকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে ধাবিত হওয়া। দুনিয়ার দৌড়ে মানুষ পদক বা ট্রফির দিকে ছোট্ট, কিন্তু মহান আল্লাহ মুমিনকে এমন এক দৌড়ে ডাক দিয়েছেন যার শেষ সীমানায় রয়েছে জান্নাত। ইবনু আশুর (১২৯৬-১৩৯৩ হি./১৮৭৯-১৯৭৩ খ্রি.) বলেন, الْمُسَابَقَةُ كِتَابِيَّةٌ عَنِ الْمُنَافَسَةِ ‘আল-মুসাঝাক্বাহ হ’ল আল-মুনাফাসাহ-এর একটি রূপক বা ইঙ্গিতবাহী শব্দ’।^৭ অর্থাৎ আমাদের অন্তরের নেক আমল

করার সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষাটি যখন বাস্তব কাজে বা দৌড়ে রূপ নেয়, সেটাই মুসাঝাক্বা।

মহান আল্লাহ বান্দাদের সেই প্রতিযোগিতায় শরীক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, ‘তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার ন্যায়। যা প্রস্তুত করা হয়েছে ঐসব লোকদের জন্য, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ ও তার রাসূলগণের উপর। যেটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি এটা দান করেন, যাকে তিনি চান। বস্তুতঃ আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী (হাদীদ-মাদানী ৫৭/২১)। অত্র আয়াতের তাফসীরে ইমাম শাওকানী (১১৭৩-১২৫০ হি./১৭৫৯-১৮৩৪ খ্রি.) বলেন, سَارِعُوا مُسَارِعَةَ السَّابِقِينَ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي تُوجِبُ الْمَغْفِرَةَ لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، وَتُؤْتِيكُمْ مِمَّا وَقَعَ مِنْكُمْ مِنَ الْمَعَاصِي، ‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা অবধারিতকারী নেক আমলসমূহের মাধ্যমে অগ্রগামীদের ন্যায় দ্রুত ধাবিত হও, আর তোমাদের দ্বারা সংঘটিত যাবতীয় পাপকাজ থেকে তওবা করো’।^৮

একটু ভাবুন তো! অফিসে বসের সাথে কোন কারণে আপনার ভুল বোঝাবুঝি হ’ল। চাকরী বাঁচাতে আপনি কি চুপ করে বসে থাকবেন? নাকি কালক্ষেপণ না করে সাথে সাথে ক্ষমা চেয়ে বিষয়টা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবেন? আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কটা কি তার চেয়েও কোটি গুণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়?

পবিত্র কুরআনে ঈমানদারদের আমলের ওপর ভিত্তি করে তাদেরকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُاذِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, ‘অতঃপর আমরা কিতাবের অধিকারী করলাম আমাদের বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে, যাদেরকে আমরা মনোনীত করেছি। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ হ’ল নিজের উপর অত্যাচারী। কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং কেউ আল্লাহর অনুমতিক্রমে কল্যাণ কর্মসমূহে অগ্রগামী। যেটি হ’ল মহা অনুগ্রহ’ (ফাত্তির-মাক্কী ৩৫/৩২)।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, السَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَالْمُقْتَصِدُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ

৪. রাগেব আল-ইছফাহানী, আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন, তাহক্বীক: ছাফওয়ান আদনান আদ-দাউদী (দামেস্ক ও বেরুত: দারুল কুলম ও আদ-দারুশ শামিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি.), পৃ. ৮১৮।

৫. মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন, তাফসীর জুযই আম্মা, (রিয়াদ: দারুছ ছুরাইয়া লিন-নাশর ওয়াত তাওযী’, ২য় সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ১০৫।

৬. মুছল্লাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ৭/১৮৮।

৭. মুহাম্মাদ তাহির ইবনু আশুর, আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর (তিউনিসিয়া: আদ-দারুত তিউনিসিয়াহ লিন-নাশর, ১৯৮৪ খ্রি.), ২৭/৪০৭।

৮. মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শওকানী আল-ইয়ামানী, ফাতহুল কাদীর (দামেস্ক ও বেরুত: দারু ইবরাহীল কাছীর ও দারুল কালিমিত ত্বইয়েব, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি.), ৫/২১০।

وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ وَأَصْحَابُ الْأَعْرَافِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ، ‘সৎকাজে অগ্রগামী ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে; মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী আল্লাহর রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর নিজের ওপর অবিচারকারী (গোনাহগার মুমিন) এবং আ‘রাফবাসী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শাফা‘আতের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবে’।^{১০} মূলত অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ ঈমানের তিনটি স্তর উল্লেখ করেছেন।

(ক) সর্বনিম্ন স্তর (طَائِفَةٌ لِنَفْسِهِ) : যারা ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও অবহেলাবশত কিছু ওয়াজিব ত্যাগ করেন এবং কাবীরা গোনাহে জড়িয়ে পড়েন, তবে কুফরী বা বড় শিরকে লিপ্ত হন না। গোনাহগার হ’লেও ঈমান থাকার কারণে চূড়ান্ত বিচারে তারা আল্লাহর করুণা ও মাগফিরাতের অধিকারী এই স্তরের বান্দাদেরকে ক্রটিপূর্ণ মুসলিম, ফাসেক ও ফাজের বলা হয়।

(খ) মধ্যম স্তর (الْمُقْتَصِدُ) : যারা ফরয ইবাদতের অতিরিক্ত নফল-সুন্নাতে তেমন যত্নবান নন বা ছোটখাটো মাকরুহ এড়িয়ে চলেন না, তবে ইসলামের মৌলিক ফরয-ওয়াজিব বিধানগুলো রক্ষা করেন এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকেন। এই স্তরের বান্দাদের মুমিন বা মুসলিম বলা হয়।

(গ) সর্বোচ্চ স্তর (سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ) : যারা ফরয-ওয়াজিবের পাশাপাশি নফল-মুস্তাহাবও পুরোপুরি পালন করেন এবং হারামসহ সব ধরনের মাকরুহ ও সন্দেহজনক বিষয় কঠোরভাবে এড়িয়ে চলেন। এই স্তরের বান্দাদের মুহসিন বলা হয়। এটা নবী-রাসূল, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবায়ে কেরাম, ছিদ্দীক্ব ও শহীদদের স্তর। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، فِي حَتَّاتِ التَّعِيمِ، ‘আর অগ্রভাগের লোকেরা। তারা তো অগ্রবর্তীই। তারা হ’ল নৈকট্যশীল। তারা থাকবে নে‘মতপূর্ণ জান্নাত সমূহে’ (ওয়াক্বি‘আহ ৫৬/১০-১২)।

ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফদের জীবনে এই অগ্রগামী হওয়ার প্রতিযোগিতার বহু নথীর রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ হ’ল ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর সেই অবিস্মরণীয় ঘটনা। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে দান-হাদাক্বাহ করার নির্দেশ দিলেন। তখন কাকতালীয়ভাবে আমার নিকট কিছু ধন-সম্পদ ছিল। আমি (মনে মনে) বললাম, ‘আবুবকরকে যদি কোন দিন অতিক্রম করতে পারি, তবে আজই আমি তাকে অতিক্রম করব’। তিনি বলেন, ফলে আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ? আমি বললাম, অনুগ্রহ (অর্ধেক) সম্পদ। আর আবুবকর তাঁর

নিকট যা ছিল তার সমুদয় সম্পদ নিয়ে আসলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘হে আবুবকর! তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ?’ তিনি বললেন, اللَّهُ وَرَسُولُهُ, ‘তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি’। তখন আমি (মনে মনে) বললাম, لَا أَسْبِقُهُ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا, ‘আমি কখনোই কোন বিষয়ে তাঁর চেয়ে অগ্রগামী হ’তে পারব না’।^{১০}

অন্য বর্ণনায় ওমর (রাঃ) বলেন, وَلَا وَاللَّهِ مَا سَابَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ، ‘আল্লাহর কসম! আমি কখনোই কোন কল্যাণকর কাজে তাঁর সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইনি, যাতে তিনি আমার চেয়ে অগ্রগামী হননি’।^{১১} ছাহাবায়ে কেরাম কিভাবে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য মরিয়া ছিলেক। এই একটা ঘটনাই তা বোঝার জন্য যথেষ্ট। দুনিয়ার কোন সম্পদ জমানোর প্রতিযোগিতা তাদের ছিল না। ছিল কেবল আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক অনন্য প্রতিযোগিতা। তাই তো মহান আল্লাহ বলেন, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ حَتَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ‘প্রথম দিকের মুহাজির ও আনছারগণ এবং পরে যারা তাদের অনুসারী হয়েছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ’ল মহা সফলতা’ (তওবা ৯/১০০)।

৩. আল-মুসারা‘আহ (المُسَارَعَةُ)‘আহ

‘মুসারা‘আহ’ শব্দের মূল অর্থ হ’ল জড়তা ঝেড়ে ফেলে ক্ষিপ্ততার সাথে কোন লক্ষ্য পানে ধাবিত হওয়া। প্রখ্যাত ভাষাবিদ মুরতাযা আয-যুবাইদীর (১১৩২-১২০৫ হি./১৭২০-১৭৯১ খ্রি.) বলেন، الْمُسَارَعَةُ: الْمُبَادَرَةُ إِلَى الشَّيْءِ، ‘আল-মুসারা‘আহ অর্থ হ’ল কোন বিষয়ের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া’।^{১২} অর্থাৎ নেক আমল ও কল্যাণের পথে কালক্ষেপণ না করে ক্ষিপ্তগতিতে অগ্রগামী হওয়াই হ’ল মুসারা‘আহ। পার্থিব জীবনে আমাদের ঘর-বাড়ীতে হঠাৎ আগুন লেগে গেলে আমরা যেমন জীবন বাঁচাতে তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্ততার সাথে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটে যাব। ঠিক তেমনি গোনাহের আগুন থেকে বাঁচতে এবং জান্নাতের পথে অগ্রসর হ’তে মহান আল্লাহ এই ক্ষিপ্ততার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি

১০. আবু দাউদ হা/১৬৭৮; তিরমিযী হা/৩৬৭৫; মিশকাত হা/৬০২১, সনদ হাসান।

১১. আহমাদ হা/১৭৫; ছহীহ ইবনে খুযাইমা হা/১১৫৬, সনদ ছহীহ।

১২. মুরতাযা আয-যাবাদীর, তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস, (কুয়েত: দারুল হিদায়া, তা.বি), ২১/১৯২।

৯. ভাবারানী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/১১৬৬২; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৬/৫৪৭।

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَحَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য' (আলে ইমরান ৩/১৩৩)। প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনু জুবাইর (৪৬-৯৫হি.) এই আয়াতের তাফসীরে বলতেন, سَارِعُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, 'তোমরা নেক আমল সমূহের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা লাভের উদ্দেশ্যে দ্রুত ধাবিত হও'।^{১৩}

আলী (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে তাফসীরে কুরতুবীতে এসেছে, এই আয়াতে ক্ষমার দিকে ধাবিত হওয়া বলতে বোঝানো হয়েছে, 'ফরয ইবাদত সম্পাদনে এবং তাকবীরে তাহরীমার সাথে ফরয ছালাত আদায়ের ব্যাপারে দ্রুত ধাবিত হওয়া'।^{১৪} যে ব্যবসায়ী আযান শোনার সাথে সাথে মসজিদের দিকে ছুটে যান, কোন পাপ হয়ে গেলে সাথে সাথে তওবা-ইস্তিগফার করে নিজেকে শুধরে নেন, কোন নেক আমলের সুযোগ লাভের সাথে সাথে সেটা করে ফেলেন, যে গৃহিনী আযানের ডাক শোনা মাত্র সংসারের যাবতীয় কাজ ফেলে রেখে মুছল্লাতে দাঁড়িয়ে যেতে পারেন, তারাই হ'লেন সেই সৌভাগ্যবান বান্দা, যারা 'মুসারা'আহ'-এর ডাকে সাড়া দেন।

শুধু ব্যক্তিজীবনে নয়, পারিবারিক জীবনেও মুসারা'আহ-এর চর্চা থাকা চাই। যেমনটি ছিল নবী যাকারিয়া (আঃ)-এর পরিবারে। আল্লাহ বলেন, وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ 'আর (স্মরণ কর) যাকারিয়ার কথা। যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে একাকী (নিঃসন্তান) ছেড়ে দিয়ো না। আর তুমিই তো সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। অতঃপর আমরা তার দো'আ কবুল করলাম এবং তাকে দান করলাম ইয়াহইয়াকে। আর গর্ভধারণের জন্য তার স্ত্রীকে সক্ষম করে দিলাম। তারা সর্বদা সৎকর্মে অগ্রণী থাকত। তারা আকাংক্ষা ও ভীতির সাথে আমাদের আহ্বান করত। আর তারা ছিল আমাদের প্রতি বিনীত (আমিয়া-মাক্কী ২১/৮৯-৯০)। একটু লক্ষ্য করুন, সন্তান না হওয়ার মতো এত বড় একটা মানসিক কষ্টের মাঝে থেকেও তাঁরা স্বামী-স্ত্রী নেক আমলে বিন্দুমাত্র পিছিয়ে যাননি, বরং সৎকর্মে তাঁরা ছিলেন অগ্রণী! আজ আমাদের পরিবারগুলোতে একটু অভাব বা বিপদ এলেই আমরা হতাশ হয়ে ইবাদত কমিয়ে দিই। অথচ আমাদের উচিত ছিল স্বামী-স্ত্রী মিলে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে

একে অপরকে দ্বীনের পথে এগিয়ে নেওয়া।

৪. আল-ইস্তিবাক (الاستِيقَاق) :

'আল-ইস্তিবাক' পরিভাষাটি মুমিনদের এক যৌথ উদ্দীপনাকে নির্দেশ করে, যেখানে প্রত্যেকেই তার অবস্থান থেকে একটি অভিন্ন লক্ষ্যে একে অন্যকে ছাড়িয়ে সেরা হওয়ার সাধনায় রত থাকেন। আল্লাহ বলেন, وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا, 'আর প্রত্যেকের জন্য রয়েছে কিংবলা, যেদিকে সে ইবাদতকালে মুখ ফিরায়ে। কাজেই তোমরা সৎকর্ম সমূহে প্রতিযোগিতা কর। যেখানেই তোমরা থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান' (বাক্বারাহ ২/১৪৮)।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ-এর অর্থ হ'ল- 'সَارِعُوا إِلَى الطَّاعَاتِ, 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্যমূলক সৎকাজে দ্রুত ধাবিত হও'।^{১৫} হাফেয ইবনু কাছীর (১৩০১-১৩৭৩ খ্রি.) বলেন, এর অর্থ হ'ল- الْمُسَارَعَةُ إِلَى الْخَيْرَاتِ 'বলেন, এর অর্থ হ'ল- 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্যের পানে দ্রুত ধাবিত হও'।^{১৬}

একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। ধরুন! একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তার ক্যাম্পাসে বসে বন্ধুদের সাথে আড্ডায় মেতে আছে, হঠাৎ যোহরের আযান হ'ল। সে আড্ডা ছেড়ে সবার আগে মসজিদের দিকে পা বাড়াল। অন্যদিকে একজন মা, যিনি হয়তো তখন রান্নাঘরে তীব্র গরমের মাঝে পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করছেন এবং মুখে অবিরাম 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ' যিকির চালিয়ে যাচ্ছেন। এই দু'জন ব্যক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে থেকেও নিজ নিজ জায়গা থেকে 'আল-ইস্তিবাক' বা জান্নাতের প্রতিযোগিতায় দৌড়াচ্ছেন।

আমাদের জীবনের পরীক্ষাগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। একজন ব্যবসায়ীকে পরীক্ষা করা হচ্ছে তার সম্পদের হালাল-হারাম দিয়ে, আর একজন চাকরিজীবীকে পরীক্ষা করা হচ্ছে তার দায়িত্ববোধ ও সততা দিয়ে। আল্লাহ চাইলে সবাইকে এক রকম বানাতে পারতেন, কিন্তু তিনি বৈচিত্র্য দিয়েছেন কেবল আমাদের পরীক্ষা করার জন্য। আল্লাহ বলেন, لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

১৫. তাফসীরে কুরতুবী ৬/২১১।

১৬. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩/১৩০।

১৭. জালালুদ্দীন সুহুত্বী ও জালালুদ্দীন মাহাল্লী, তাফসীরুল জালালাইন (কায়রো: দারুল হাদীছ, ১ম প্রকাশ), পৃ. ৩০।

১৩. জালালুদ্দীন সুহুত্বী (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), আদ-দুরুল মানসুর ফী তাফসীরিল মা'ছুর (বৈরত: দারুল ফিকর, তা.বি, ২/৩১৪)।
১৪. তাফসীরে কুরতুবী ৪/২০৩।

لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ
تَخْلِفُونَ, ‘আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে তিনি এক দলভুক্ত
করে দিতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে যে বিধানসমূহ
দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নিতে। অতএব তোমরা
আল্লাহর আনুগত্যের কর্মসমূহে প্রতিযোগিতা কর। (মনে
রেখ) আল্লাহর নিকটেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন স্থল।
অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন যেসব বিষয়ে
তোমরা মতভেদ করতে’ (মায়দা-মাদানী ৫/৪৮)। এই আয়াতের
মর্মার্থ হ’ল- আপনি আপনার ময়দানে সেরাটা দিন। একজন
উদ্যোক্তা তার ব্যবসার মাধ্যমে হালাল রিযিক উপার্জনের
পাশাপাশি মানুষের কর্মসংস্থান করে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে
যাবেন। একজন নারী তার পর্দা, শালীনতা ও মমতা দিয়ে
পরিবারকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী
হবেন। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব ট্র্যাকে দৌড়াবে, কিন্তু সবার
গন্তব্য হবে একটাই। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত।

৫. আল-মুবাদারাহ (المُبَادَرَةُ)

‘মুবাদারাহ’ পরিভাষাটির মূল অর্থ হ’ল এমন ক্ষিপ্ততা,
যেখানে সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার পূর্বেই মানুষ বিদ্যুৎবেগে
ঝাঁপিয়ে পড়ে। আল্লামা শারফুদ্দীন জীবী (মৃ. ৭৪৩
হি./১৩৪৩ খ্রি.) বলেন, الْمُبَادَرَةُ الْمُسَارَعَةُ بِإِدْرَاكِ الشَّيْءِ قَبْلَ
فَوَائِدِهِ ‘আল-মুবাদারাহ হ’ল- কোন কিছু হাতছাড়া হয়ে
যাওয়ার পূর্বেই তা অর্জনে দ্রুত ধাবিত হওয়া’।^{১৮}

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই একেকটি সুযোগ। একজন গবেষক
বা শিক্ষক যখন কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নতুন কোন ইলম বা
জ্ঞান অর্জন করেন, তখন তা ডায়রীতে লিখে রাখার
পাশাপাশি সাথে সাথে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করাটাই হ’ল
মুবাদারাহ। যৌবনের শক্তি, সুস্থতা কিংবা অবসর- এগুলো
যেকোন সময় ফুরিয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে এমন এক
সময় আসবে, যখন ঈমান ধরে রাখাই কঠিন হয়ে যাবে।
সেই ভয়ংকর সময়ের সতর্কবার্তা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)
বলেন, بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فَنَآ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ
الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُؤْسِي كَافِرًا، وَيُؤْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا،
‘অন্ধকার রাতের টুকরো সমূহের
মত (যা একটার পর একটা আসতে থাকে এমন) ফিৎনা
আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে
সময় সকালে একজন মুমিন হ’লে বিকালে কাফের হয়ে
যাবে। বিকালে মুমিন হ’লে সকালে কাফের হয়ে যাবে।
দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দ্বীন বিক্রি করে বসবে’।^{১৯}

১৮. শারফুদ্দীন আত-জীবী, আল-কাশিফ ‘আন হাক্বাইক্বিস সুন্নাহ,
তাহক্বীক্ব: ড. আব্দুল হামিদ হিন্দাবী (রিয়াদ: মাকতাবাতু নিয়ার
মুহত্তফা আল-বায়, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), ১১/৩৪০৬।
১৯. মুসলিম হা/১১৮; তিরমিযী হা/১৯৫।

অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম ছান‘আনী (১০৯৯-১১৮২
হি./১৬৮৭-১৭৬৯ খ্রি.) বলেন, سَابِقُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ, (রিয়াদ:
মাকতাবাতু রশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.), ৪/৫২৬।
ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হি./১২৩৩-১২৭৭ খ্রি.) বলেন,
‘হাদীছটির মর্মার্থ হ’ল নেক আমল অসম্ভব হয়ে পড়ার পূর্বে
এবং চাঁদবিহীন ঘোর অন্ধকার রাতের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের
ন্যায় একের পর এক উপচে পড়া ও ব্যস্ততায় ফেলে দেওয়া
ফিৎনাসমূহে জড়িয়ে পড়ার আগেই সংকাজে দ্রুত অগ্রণী
হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা’।^{২০}

অতএব নেকীর কাজে প্রতিযোগিতার অর্থ হ’ল আল্লাহর
আনুগত্যে অগ্রগামী থাকা, নেক আমলের সুযোগ লাভের
সাথে সাথে তা সম্পাদন করা, পাপের পর দ্রুত তওবা করা,
কোন জ্ঞান অর্জিত হ’লে সাথে সাথে সেটার প্রতি আমল
করা, আযান শোনা মাত্রই ছালাতের প্রস্তুতি নেওয়া, সময়মত
আউয়াল ওয়াত্তে ছালাত আদায় করা, জামা‘আতের প্রথম
কাতারে ছালাত আদায়ের চেষ্টা করা, সব সময় নেক আমলের
সুযোগ খোঁজা, আগেভাগে সালাম দেওয়া, মুসলিম ভাইয়ের
সাথে মনোমালিন্য হ’লে আগে নিজেই সংশোধন করে নেওয়া,
মানুষের খেদমত এবং তাদের সেবায় সবার আগে অগ্রণী
হওয়া ইত্যাদি। [ক্রমশ:]

২০. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আছ-ছান‘আনী (১০৯৯-১১৮২ হি./১৬৮৭-
১৭৬৯ খ্রি.), আত-তানবীর শারহুল জামি‘ইছ ছগীর, (রিয়াদ:
মাকতাবাতু রশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.), ৪/৫২৬।
২১. মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনু শারায় আন-নববী, আল-মিনহাজ শারহ
ছহীহ মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ (বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাখিল
আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯২ হি.), ২/১৩৩।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য
যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪



Bangla Food BD

আম্রা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- ▶ আম (মৌসুমি)
- ▶ লিচু (মৌসুমি)
- ▶ সকল প্রকার খেজুর
- ▶ মরিচের গুঁড়া
- ▶ হলুদের গুঁড়া
- ▶ আখের গুঁড়া (মৌসুমি)
- ▶ খেজুরের গুঁড়া (মৌসুমি)
- ▶ খাঁটি মধু
- ▶ খাঁটি গাওয়া দি
- ▶ খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- ▶ খাঁটি সরিষার তৈল
- ▶ খাঁটি জয়ন্তুনের তৈল
- ▶ খাঁটি নারিকেল তৈল
- ▶ খাঁটি কালো জিরার তৈল
- ▶ নাটোরের কাঁচাপোল্লা ও
বগুড়ার দই

যোগাযোগ

- ① facebook.com/banglafoodbd
- ② E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
- ③ Whatsapp & lmo : 0171-103904
- ④ www.banglafoodbd.com



SCAN ME

যুগে যুগে শী'আদের অপতৎপরতা

-মুজাহিদুল ইসলাম*

ভূমিকা :

ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে জন্ম নেওয়া এক সুদূরপ্রসারী ও গুপ্ত চক্রান্তের নাম শী'আ। তাদেরকে 'ছদ্মবেশী ইহুদী' বললেও অত্যাচার হবে না। এরা যে ইহুদীদের ক্রীড়নক হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তারা যে ইহুদীবাদেরই দ্বিতীয় সংস্করণ- এটি দালীলিক সূত্র ও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত এক নিরেট বাস্তবতা। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, বৈষয়িক কর্মকাণ্ড এবং সুন্নী মুসলিম ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোর প্রতি তাদের রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শের মাধ্যমে এই বাস্তবতাই বারবার স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ইমাম ইবনু আবিল ইয় আল-হানাফী (৭৩১-৭৯২ হি./১৩৩১-১৩৯০ খ্রি.) বলেন, রাফেযী শী'আদের গোড়াপত্তন হয়েছিল আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা নামক একজন যিন্দীক মুনাফিকের মাধ্যমে, যার উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মকে বাতিল করা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সমালোচনা ও তাঁকে অপমান করা।^১ যুগে যুগে ইসলামী খেলাফত ও খলীফাদের বিরুদ্ধে তাদের ব্যাপক ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতার প্রমাণ ইতিহাসের পরতে পরতে চিত্রিত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে যে ভয়াবহ ফিতনা ও অপতৎপরতার চাষাবাদ তারা করেছে, তা অকল্পনীয়। তারা মুসলিমদের আক্বীদা ও বিশ্বাসকে ভ্রষ্টতার শেষ চূড়ায় নিয়ে গেছে। যেমনভাবে তারা মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হেনেছে। তেমনভাবে অপরাধনীতি ও অপসংস্কৃতির বেষ্টিনে মুসলিমদের আবদ্ধ করে রেখেছে। মুসলিম বিশ্বে খেলাফতের পতাকাতলে যখন উম্মাহ এক্যবদ্ধ ছিল, তখনও তারা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অপতৎপরতার এতটাই শীর্ষে অধিষ্ঠিত হয়েছিল যে, সমকালীন ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম খলীফাগণ তাদের মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করতেন। মুসলিম উম্মাহকে তাদের আক্বীদাগত বিভ্রান্তি ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিষাক্ত ছোবল থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সালাফে ছালিহীন ও মুসলিম শাসকবর্গ আমৃত্যু নিরলস সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন। সালাফদের আদর্শিক পথচলার সেই ধারাবাহিকতায় আমরাও মনে করি- বর্তমান বৈশ্বিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় শী'আ মতাদর্শের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করা সময়ের এক অপরিহার্য দাবী। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের অবতারণা।

যুগে যুগে শী'আদের অপতৎপরতা :

যুগে যুগে শী'আদের অপতৎপরতার ইতিহাস অত্যন্ত সুদীর্ঘ ও বহুমাত্রিক। তাদের চক্রান্তের জাল এতোটাই বিস্তৃত যে, ক্ষুদ্র কোন পরিসরে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা সহজসাধ্য নয়। তবে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা তাদের

এসব অপতৎপরতাকে প্রধানত দু'টি ভাগে বিভক্ত করে পর্যালোচনা করব ইনশাআল্লাহ। যথা- ১. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অপতৎপরতা। ২. সামাজিক ও রাজনৈতিক অপতৎপরতা।

১. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অপতৎপরতা

প্রথমত, তারা মুসলিম উম্মাহকে তাদের বিশুদ্ধ ধর্মীয় আক্বীদাহ-বিশ্বাস ও ইসলামী চেতনা থেকে বিচ্যুত করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কেননা যেকোন জাতির আমল বা কর্মগত বিচ্যুতির জন্য সর্বপ্রথম তার আক্বীদা বা বিশ্বাসগত বিভ্রান্তি অপরিহার্য। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মুকাবিলায় তাদের জনবল ও রাজনৈতিক শক্তি ছিল চরম শূন্যতায়। তৎকালীন সময়ে সুন্নী মুসলিমরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শাসনক্ষমতা বা খিলাফতের একচ্ছত্র অধিকারী। যার ফলশ্রুতিতে, প্রাথমিকভাবে তারা অত্যন্ত গোপনে ও সুকৌশলে সাধারণ মানুষের মাঝে তাদের ভ্রান্ত দাওয়াত ও মতাদর্শ প্রচার করতে থাকে। অতঃপর কালের পরিক্রমায়, দীর্ঘ ষড়যন্ত্র ও সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে তারা একসময় বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হ'তে সক্ষম হয়। তাদের এই অপতৎপরতার প্রধান মাধ্যমগুলো ছিল নিম্নরূপ-

১. ইহুদী ও মজুসীদের মুসলিম ছদ্মবেশ ধারণ :

রাফেযী শী'আদের যেসব বুনিয়াদী আক্বীদার ওপর তাদের সামগ্রিক ধর্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, তার মূল প্রবর্তক ছিল ইয়েমেনের অধিবাসী আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা নামক এক ধূর্ত ইহুদী। খলীফা ওহমান (রাঃ)-এর শাসনামলে সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর অন্তরে লালিত ঘৃণ্য আক্বীদা ও কুমতলব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং ইসলামের ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দেওয়ার মানসে সে ইসলামী খিলাফতের বিভিন্ন নগরীতে ভ্রমণ শুরু করে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত-তাবারী (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ খ্রি.) তার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে বলেন, كَانَ عِبْدَ اللَّهِ بْنِ سَبَأٍ يَهُودِيًّا مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ، أَمَهُ سَوْدَاءَ، فَأَسْلَمَ زَمَانَ عُثْمَانَ، ثُمَّ تَنَقَّلَ فِي بِلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ، يَحَاوِلُ ضَلَالَتِهِمْ، فَبَدَأَ بِالْحِجَازِ، ثُمَّ الْبَصْرَةَ، ثُمَّ الْكُوفَةَ، ثُمَّ الشَّامَ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَرِيدُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَأَخْرَجُوهُ حَتَّى أَتَى مِصْرَ، 'আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা ছিল সানা (ইয়ামান) এর অধিবাসী একজন ইহুদী, তার মা ছিল কৃষ্ণাঙ্গ। ওহমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর সে মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করার প্রয়াসে বিভিন্ন মুসলিম ভূখণ্ডে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে। অতঃপর হিজাজ থেকে শুরু করে বছরা, কুফা ও শামে যায়। কিন্তু শামের অধিবাসীদের কারও কাছে সে তার কাক্ষিত চক্রান্তে সফল হ'তে পারেনি। শামের লোকেরা তাকে সেখান থেকে বের করে দেয়। অবশেষে সে মিসরে এসে পৌঁছে'।^২

* নশীপুর, গাবতলী, বগুড়া।

১. ইবনু আবিল ইয় আল-হানাফী, শারহুল আক্বীদাতিত তাহাবিইয়াহ, (রিয়াদ: ওয়াজারাতুশ শুউনিল ইসলামিয়া ওয়াল আওকাফ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হি.), পৃ. ৫০২।

২. আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারীর আত-তাবারী, তারীখুত তাবারী (তারীখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক), তাহকীক: মুহাম্মাদ আবু ফাযল

পরবর্তীতে আমীরুল মুমিনীন আলী (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে ইবনু সাবার এই চরম সীমালঙ্ঘন ও কুফরী আকীদা (আলীকে ইলাহ বা প্রভু দাবী করা) সম্পর্কে জানতে পারলে, তিনি শী'আদের কাউকে কাউকে নির্বাসিত করেন এবং কতককে আগুনে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেন। যেমন ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.) বলেন, 'আলী বিন আবী তালিব (রাঃ) তাদের আগুনে পুড়িয়েছিলেন এবং দেশ থেকে নির্বাসিত করেছিলেন। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু সাবাকে নির্বাসিত করেছিলেন। আর আবুবকর আল-কারাওওয়াসকে তিনি 'জাবিয়াহ'-তে নির্বাসিত করেছিলেন। আর তাদের মধ্য থেকে একদল লোককে তিনি আগুনে পুড়িয়েছিলেন, যারা তাঁর কাছে এসে বলেছিল, 'আপনিই আমাদের রব'! তিনি বললেন, 'আমি কে? তারা বলল, رَبُّنَا, أَنْتَ 'আপনি আমাদের প্রতিপালক'। তখন তিনি আগুন জ্বালানোর আদেশ দিলেন। আগুন প্রজ্বলিত করা হ'ল এবং তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করা হ'ল। তাদের সম্বন্ধেই আলী (রাঃ) বলেছিলেন,

لَمَّا رَأَيْتُ الْأَمْرَ مُنْكَرًا + أَحْجَتُ نَارِي، وَدَعَوْتُ فِتْرًا

'যখন আমি বিষয়টিকে চূড়ান্ত এক গর্হিত কাজ হিসাবে দেখলাম... তখন আমি আগুন প্রজ্বলিত করলাম এবং (আমার দাস) ক্বানবারকে ডেকে পাঠলাম'।^{১০} কিন্তু তারপরেও তার কিছু অনুসারী বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকায়, তাদের গুপ্ত দাওয়াত ধীরগতিতে এগিয়েই চলছিল। এভাবেই তারা উমাইয়া শাসনামলেও আকীদাগত বিভ্রান্তি ছড়ানোর এজেন্ডা নিয়ে এগোতে থাকে এবং পাশাপাশি উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে আব্বাসীয়দেরও সূক্ষ্ম ইন্ধন জোগাতে থাকে।

এরপর হিজরী ২য় শতাব্দীতে আব্বাসীয় খিলাফতের সময় সিরিয়ার 'হিমছ' শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত সালামিয়া অঞ্চলে আবির্ভাব হয় আরেক ছদ্মবেশী মুসলিমের। তার নাম ছিল মাইমুন আল-কাদ্দাহ। তার পিতা 'দাইসান' ছিল একজন ইহুদী (মতান্তরে মজুসী)। মাইমুন বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নিজেকে শী'আ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সালামিয়া অঞ্চলই ছিল তাদের গুপ্ত দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার মূল কেন্দ্র। একই সময়ে দক্ষিণ ইরাকে 'মাহরুরাহ' নামক এক শী'আ দাঈর আত্মপ্রকাশ ঘটে। সে মূলত পারস্যের অধিবাসী ছিল। নিজের অন্তরে অগ্নিপূজার (মজুসী) আকীদাহ-বিশ্বাস গোপন রেখে সে মুসলিম বেশভূষা

ধারণ করেছিল। অনুরূপভাবে পরিচয় গোপনকারী আরেক ধূর্ত ব্যক্তি ছিল হুসাইন আল-আহওয়াযী। যে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের কথিত গোপন ইমামের দূত হিসাবে কাজ করত। তৎকালীন সময়ে আরেক ইহুদী নিজের পোষাক বদলে শী'আ মুসলিমের ছদ্মবেশ ধারণ করে, যার নাম ছিল হামদান আল-কারমাতু (যার অনুসারীদেরকে 'কারামিতা' বলা হয়)। তার বংশীয় শেকড় ছিল মূলত নাজরানের ইহুদীদের সাথে সম্পৃক্ত।^{১১} শুধু তাই নয়, ২৯৭ হিজরীতে (৯০৯ খ্রি.) উত্তর আফ্রিকার তিউনিসিয়ায় শী'আদের যে শক্তিশালী 'উবাইদইয়াহ' সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ৩৫৮ হিজরীতে (৯৬৯ খ্রি.) মিসর বিজয়ের পর যা 'ফাতেমী সাম্রাজ্য' নামে আত্মপ্রকাশ করে, এই সাম্রাজ্যের প্রধান বা স্বঘোষিত ইমাম মাহদী দাবীদার ব্যক্তিটি মূলত সালামিয়ার এক কর্মকার (হাদ্দাদ) বংশের লোক ছিল। তার মূল নাম ছিল উবাইদ। যে জন্মগতভাবে একজন ইহুদী ছিল। পরবর্তীতে সে মধ্যপ্রাচ্যে এসে 'ওবায়দুল্লাহ' নাম ধারণ করে এবং নিজেকে হযরত আলী ও ফাতেমা (রাঃ)-এর বংশধর হিসাবে মিথ্যা দাবী করে। এই ওবায়দুল্লাহর বংশ পরিচয় সম্পর্কে ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি./১২৭৪-১৩৪৮ খ্রি.) বলেন,

وَلَا نَسِبُهُمْ صَحِيحًا، بَلِ الْمَعْرُوفُ أَنَّهُمْ بَنُو عُيَيْدٍ. وَكَانَ وَالِدُ عُيَيْدٍ هَذَا مِنْ نَسْلِ الْقَدَّاحِ الْمُلْحِدِ الْمَجُوسِيِّ. قَالَ: وَقِيلَ: كَانَ وَالِدُ عُيَيْدٍ هَذَا يَهُودِيًّا مِنْ أَهْلِ سَلْمِيَّةَ، وَكَانَ حَدَّادًا. وَعُيَيْدٌ كَانَ اسْمُهُ سَعِيدًا، فَلَمَّا دَخَلَ الْمَغْرِبَ تَسَمَّى بِمُيَيْدٍ لِلَّهِ، وَادَّعَى نَسَبًا لَيْسَ بِصَحِيحٍ. وَذَكَرَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَنْسَابِ، ثُمَّ تَرَقَّتْ بِهِ الْحَالُ إِلَى أَنْ مَلَكَ الْمَغْرِبَ، وَبَنَى الْمَهْدِيَّةَ، وَتَلَقَّبَ بِالْمَهْدِيِّ. وَكَانَ زَنْدِيْقًا خَبِيْثًا، عَدُوًّا لِلْإِسْلَامِ. قَتَلَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَالْمُحَدِّثِينَ، وَالصَّالِحِينَ جَمَاعَةً كَبِيرَةً، وَنَشَأَتْ ذُرِّيَّتُهُ عَلَى ذَلِكَ. وَبَقِيَ هَذَا الْبَلَاءُ عَلَى الْإِسْلَامِ مِنْ أَوَّلِ دَوْلَتِهِمْ إِلَى آخِرِهَا، وَذَلِكَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةِ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ إِلَى سَنَةِ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ.

'তাদের বংশপরিচয় সঠিক নয়; বরং প্রসিদ্ধ হ'ল তারা বনু ওবায়দের অন্তর্গত। আর এই ওবায়দের পিতা ছিল এক নাস্তিক অগ্নিউপাসক কাদ্দাহের বংশধর। বলা হয়ে থাকে, এই ওবায়দের পিতা ছিল সালামিইয়াহ অঞ্চলের একজন ইহুদী কামার। আর ওবায়দের নাম ছিল সাঈদ; কিন্তু সে যখন

ইবরাহীম (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৭ হি./১৯৬৭ খ্রি.), খণ্ড ৪, পৃ. ৩৪০; আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আলী ইবনুল জাওযী (৫১০-৫৯৭ হি./১১১৬-১২০১ খ্রি.), আল-মুনতায়াম ফি তারীখিল মুলুকি ওয়াল উমাম, তাহকীক: মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আতা ও মুস্তফা আব্দুল কাদির আত্ভা (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), খণ্ড ৫, পৃ. ৪৯।

৩. আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.), মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাইয়াহ, তাহকীক: ড. মুহাম্মদ রাশাদ সালিম (রিয়াদ : জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০; এ, মাজমু'ল ফাতাওয়া, ১৩/৩৩।

৪. শায়খ মাহমুদ শাকির, আব্বাসীয় খিলাফতের ইতিহাস অনু: শাহ মুহাম্মাদ খালিদ, জমির মাসরুর, (ঢাকা: মুহাম্মাদ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০২২ খ্রি.) ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮-৯০।

মাগরেব (উত্তর আফ্রিকা)-এ প্রবেশ করল, তখন সে নিজের নাম রাখল ‘ওবায়দুল্লাহ’ এবং একটি অসত্য বংশপরিচয় দাবী করল। বংশ বিশেষজ্ঞ আলেমদের একটি দল এ কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তার অবস্থার উন্নতি হ’তে হ’তে সে মাগরেবের শাসক বনে গেল, ‘মাহদিইয়াহ’ নগরী প্রতিষ্ঠা করল এবং ‘আল-মাহদী’ উপাধিতে ভূষিত হ’ল। সে ছিল একজন খবীছ যিন্দীক এবং ইসলামের চরম শত্রু। সে অসংখ্য ফক্বীহ, মুহাদ্দিছ ও সৎকর্মশীল লোককে হত্যা করেছে এবং তার বংশধররাও এই নীতির ওপর বড় হয়েছে। আর ইসলামের ওপর এই মুছীবত তাদের রাজত্বের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বহাল ছিল, যা ২৯৯ হিজরীর যিলহজ্জ মাস থেকে শুরু করে ৫৬৭ হিজরী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।^৫ এভাবেই তৎকালীন শী‘আ রাফেযী গোষ্ঠীগুলো ইহুদী ও মজুসীদের মুসলিম ছদ্মবেশে ইসলামে অনুপ্রবেশের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

২. আহলে বায়তের প্রতি কৃত্রিম ভালোবাসা ও ভুয়া বংশপরিচয়ের আড়ালে জনসমর্থন লাভ :

শী‘আদের এই চক্রান্তটি মুসলিম সমাজকে সবচেয়ে বেশী বিভ্রান্তি ও ধোঁকায় ফেলেছে। ইতিহাস সাক্ষী, আব্বাসীয় খিলাফতের যুগেই অসংখ্য ইহুদী, পারস্যের মজুসী (অগ্নিপূজক) এবং যিন্দীকুরা সুকৌশলে মুসলিম ছদ্মবেশ ধারণ করে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। স্বভাবতই নবী পরিবারের (আহলে বায়ত) প্রতি সাধারণ মুসলিমদের অন্তরে এক গভীর ও অকৃত্রিম ভালোবাসা বিদ্যমান ছিল। অন্যদিকে শী‘আরা আহলে বায়তের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের নামে চরম সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত হ’ত। ছদ্মবেশী এই ইহুদী ও যিন্দীকুরা শী‘আদের এই অন্ধ আবেগকে পুঁজি করে তাদের কাছাকাছি ভিড়তে শুরু করে। তারা আহলে বায়তের প্রতি মিথ্যা ভক্তি ও মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসার অভিনয় করে সাধারণ মুসলিমদের অত্যন্ত আপনজনে পরিণত হয় এবং সুকৌশলে তাদের মাঝে আকীদাগত বিভ্রান্তির বিষবাস্প ছড়িয়ে দেয়।

আবার এই চক্রান্তকারীদের অনেকেই পূর্ব থেকে নিজেদের প্রকৃত বংশপরিচয় গোপন রাখত। তারা নিজেদেরকে আহলে বায়তের সদস্য হিসাবে মিথ্যা দাবী করে বিভিন্ন অপ্রসিদ্ধ ও দূরবর্তী অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করত, যাতে কেউ তাদের আসল পরিচয় উদ্ঘাটন করতে না পারে। সেখানে গিয়ে ধীরে ধীরে নিজেদেরকে নবী পরিবারের বংশধর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে সমাজের মর্যাদাপূর্ণ স্থানগুলো দখল করে নিত। এমনকি বর্তমান যুগের কথিত শী‘আরা (বিশেষ করে রাফেযী ও ইছনা আশ‘আরিয়ারা) যাদেরকে তাদের ‘ইমাম’ বলে দাবী করে এবং নবী পরিবারের পবিত্র বংশধর হিসাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করে, ঐতিহাসিকভাবে তাদের অনেকেই মিথ্যুক ও ভুয়া বংশদাবীদার। মূলত তাদের পূর্বপুরুষদের অনেকেই ছিল

বংশগত ইহুদী অথবা পারস্যের মাজুসী। আব্বাসীয় খিলাফতের যুগে তাদের এই ভয়াবহ অনুপ্রবেশ ও অপতৎপরতার বিষয়টি ঐতিহাসিক পর্যালোচনার মাধ্যমে সুপ্রমাণিত।^৬

আহলে বায়তের ভালোবাসার আড়ালে ইসলাম ধ্বংসের এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.) বলেন, ‘তারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের ভান করত এবং নিজেদের শী‘আ দাবী করত। ফলে তাদের প্রকাশ্য রূপটি ছিল রাফেযী (চরমপন্থী শী‘আ), কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ রূপটি ছিল মুলহিদ ও যিন্দীকুদের মতো। যেমনটি আবু হামিদ আল-গাযালী তাঁর ‘আল-মুসতায়হিরী’ গ্রন্থে বলেছেন, ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض ‘তাদের বাহ্যিক রূপ হ’ল রাফেযী মতবাদ, আর তাদের অভ্যন্তরীণ রূপ হ’ল খাঁটি কুফর’। আর আবু হামিদ তাদের ব্যাপারে যা বলেছেন, তা মুসলিম আলেমদের মধ্যে সর্বসম্মত একটি বিষয়। তারা তাদের সাধারণ অনুসারীদের ইবাদতের নির্দেশ দিত এবং তাদের নিকট পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন স্তর নির্ধারিত ছিল। যখনই কেউ এক ধাপ ওপরে উঠত, তখন তার নিকট শরী‘আতের রূপক ব্যাখ্যা পেশ করত, আর যখন সে চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছত, তখন তার ওপর থেকে শরী‘আতের যাবতীয় বাধ্যবাধকতা বিলোপ করে দিত। হাসান ইবনু ছাব্বাহ ছিল তাদেরই অনুসারী, যে আল-মুস্তানহিরের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিল- যার যুগে বাছাসীরীর ফিৎনা সংঘটিত হয়েছিল। সে-ই গুপ্তহত্যার জন্য ছুরি ব্যবহারের সূচনা করেছিল এবং আলামূত দুর্গের অনুসারীরা ছিল তার অনুগামী। আর শামে সিনান ও তার সমমনারা ছিল তাদেরই অনুসারী। তাদের অভ্যন্তরীণ আকীদা ছিল অগ্নিপূজক ও দার্শনিকদের মতবাদের এক সংমিশ্রণ; তারা মাজুসীদের নিকট থেকে নূর (আলো) ও যুলমত (অন্ধকার) এই দু’টি মূল তত্ত্ব গ্রহণ করেছিল এবং দার্শনিকদের নিকট থেকে আকুল (বুদ্ধিবৃত্তি) ও নফস (আত্মা)-এর ধারণা নিয়েছিল। আর এগুলোকে তারা ‘আস-সাবিক্ব’ (অগ্রবর্তী) ও ‘আত-তালী’ (অনুবর্তী) পরিভাষায় ব্যক্ত করত।^৭

৩. ইসলামী গ্রন্থ রচনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ :

তলোয়ারের ঝনঝনানি আর রণাঙ্গনের ক্ষিপ্ততায় মুসলিমদের দমিয়ে রাখা অসম্ভব। এই বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠতেই ইহুদী-খ্রিস্টান ও যিন্দীকুরা তাদের পুরোনো রণনীতি পরিত্যাগ করে নতুন রণকৌশলের পথে অগ্রসর হ’ল। শুরু হ’ল বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ (الغزو الفكري)। মুসলিমদেরকে তাদের মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতি-আদর্শ থেকে বিচ্যুত করার এক মরণপণ চক্রান্তে তারা মেতে উঠল। এই নিকৃষ্ট এজেন্ডা

৫. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, তাহকীক: ড. বাশশার আউওয়াদ মার্কুফ (বৈরুত: দারুল গরবিল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), ১২/৩৬৯।

৬. শায়খ মাহমুদ শাকির, আব্বাসি খিলাফতের ইতিহাস, ২/৯১-৯৩।

৭. ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.), আর-রাহুল আল্লাল মানতিক্বাইয়ীন (বৈরুত: দারুল মারিফাহ, প্রকাশকাল ও সংস্করণ সংকলনে অনুলিখিত), পৃ. ২৮০।

বাস্তবায়নে তারা যে কয়েকটি কর্মপদ্ধতি সামনে রেখেছিল, তন্মধ্যে ভয়ানক হাতিয়ার ছিল- ইসলামের নামে বিকৃত গ্রন্থ রচনা। তারা মুসলিম সেজে, শী'আ সেজে, সর্বোপরি আহলে বায়তের বংশের দাবীদার হয়ে নতুন নতুন জাল হাদীছ এবং বিভিন্ন বানোয়াট ইসলামী বই লেখা শুরু করে। দীর্ঘসময় পর দেখা গেল, সাধারণ মুসলিমদের একটি বড় অংশ তাদের লেখনী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঈশ্বততার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে।

ইছনা আশ'আরিয়া (বারো ইমামিয়া) শী'আদের আকর গ্রন্থগুলো পড়লেই আমাদের কাছে সহজেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এগুলোতে বিধৃত আক্বীদাহ-বিশ্বাস কোন ধর্মভীরু একনিষ্ঠ মুসলিমের আক্বীদাহ হ'তে পারে না। মূলত তাদের মধ্যকার দুই শ্রেণীর লোক এই বিকৃত গ্রন্থগুলো রচনা করেছে: (ক) যারা ইহুদী বা মজুসী থেকে ছদ্মবেশে শী'আ হয়েছে এবং (খ) যারা জন্মগতভাবেই কটর শী'আ। এই দুই গোষ্ঠী মিলেই লেখনীর মাধ্যমে ইসলামকে বিকৃত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। তাদের এই জঘন্য লেখনী ও আক্বীদার কিছু নমুনা নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হ'ল-

(ক) জাল হাদীছ রচনা ও মুছহাফে ফাতেমীর দাবী :

আহলুস সুন্নাহর ইতিহাসবিদদের মতে, কেবল কৃষাতে বসেই তারা আলী (রাঃ) এবং তাদের বারো ইমামের ফযীলতে প্রায় তিন লক্ষ জাল হাদীছ রচনা করেছে। তাদের ধৃষ্টতা এতটাই চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তারা বর্তমান কুরআনকে অসম্পূর্ণ দাবী করে 'মুছহাফে ফাতেমী' নামক এক কাল্পনিক কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন করে। তাদের দাবী অনুযায়ী, এটি বর্তমান কুরআনের চেয়ে তিনগুণ বড় এবং এতে বর্তমান কুরআনের একটি হরফও নেই। শী'আদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীছগ্রন্থ 'উছুলু কাফী'-তে তাদের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু ইয়া'কুব আল-কুলাইনী (মৃ. ৩২৯হি/৯৪১খ্রি.) ইমাম জা'ফর আছ-ছাদিকের নামে মিথ্যা আরোপ করে উল্লেখ করেছে, *وَإِنْ عِنْدَنَا لَمُصْحَفٌ فَاطِمَةَ، عَلَيْهَا السَّلَامُ... مُصْحَفٌ فِيهِ مِثْلُ قُرْآنِكُمْ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَاللَّهُ مَا فِيهِ مِنْ قُرْآنِكُمْ حَرْفٌ وَاحِدٌ،* 'নিশ্চয়ই আমাদের নিকট মুছহাফে ফাতেমা (আঃ) রয়েছে... এটি এমন একটি মুছহাফ (গ্রন্থ), যাতে তোমাদের এই কুরআনের সমপরিমাণ তিনগুণ (অধিক) রয়েছে। আল্লাহর শপথ! তাতে তোমাদের কুরআনের একটি হরফও নেই'।^৮ এই ধরনের কুফরী গ্রন্থ কি কোন প্রকৃত মুসলমান লিখতে বা বিশ্বাস করতে পারে?

(খ) ইমামদের নিষ্পাপত্ব ও হালাল-হারাম নির্ধারণের ক্ষমতা:

তাদের আরেকটি ভয়ানক আক্বীদাহ হ'ল- তাদের ইমামগণ নবী-রাসূলগণের ন্যায় নিষ্পাপ (মা'ছুম) এবং তারা

শরী'আতের যেকোন বস্তুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রাখেন। বিস্ময়কর হ'লেও সত্য, শী'আদের এই আক্বীদার সঙ্গে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের আক্বীদার গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। যা পবিত্র কুরআনুল কারীমে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যবানেই প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, *أَتَّخِذُوا أَحِبَّارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ* 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম-পুত্র মাসীহকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে' (তাওবা ৯/৩১)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ছাহাবী আদী ইবনু হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তখন আমার গলায় স্বর্ণের তৈরি একটি ক্রুশ ঝুলছিল। তিনি আমাকে দেখে সূরা তওবার উপরিউক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'তারা তো তাদের (পাদ্রীদের) ইবাদত করত না!' তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিষয়টির প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বললেন, *أَمَّا إِيَّاهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحْلَوْا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحْلَوْهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ،* 'হ্যাঁ, তারা তাদের ইবাদত করত না। কিন্তু তাদের ধর্মীয় নেতারা যখন তাদের জন্য কোন কিছু হালাল করত, তখন তারা সেটাকে হালাল বলে মেনে নিত। আর যখন তারা তাদের জন্য কোন কিছু হারাম করত, তখন তারা সেটাকে হারাম বলেই গ্রহণ করত'।^৯

অর্থাৎ এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, আল্লাহর সুস্পষ্ট দলীল ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কথাকে হালাল-হারাম বা শরী'আতের অকাট্য বিধান হিসাবে বিশ্বাস করাই মূলত তাদেরকে রবের আসনে অধিষ্ঠিত করার শামিল। আর এটিই ছিল ইহুদী-খ্রিষ্টানদের স্বভাব। ফলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, শী'আদের এই চিন্তাধারা ইহুদী মস্তিষ্কপ্রসূত আক্বীদাহ।

(গ) ইতিহাস বিকৃতি :

তারা বিভিন্ন মিথ্যা কিছা-কাহিনীর মাধ্যমে ইসলামী ইতিহাসকে চরমভাবে বিকৃত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের বাংলাদেশের সিংহভাগ সাধারণ মানুষ কারবালার ইতিহাস জেনেছে মীর মোশাররফ হোসেন রচিত 'বিষাদ সিঙ্গ' বই থেকে। এটি মূলত একটি বিকৃত ও কাল্পনিক ইতিহাস নির্ভর উপন্যাস এবং এর লেখক পরোক্ষভাবে শী'আ মতাদর্শ ও মিথলজি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। যার কারণে বাংলার সাধারণ সুনী মুসলিমদের মাঝেও শী'আদের বানোয়াট শোকগাঁথা ও মিথ্যা ইতিহাস ঐতিহ্যের রূপ লাভ করেছে। এভাবে লেখনীর মাধ্যমে তাদের অপতৎপরতার আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা সম্ভব।

(ফ্রেমশ:)

৮. আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু ইয়া'কুব আল-কুলাইনী, আল-কাফী (উছুলু কাফী), তাহকীক: আলী আকবর আল-গিফরী (তেহরান: দারুল কুতুব আল-ইসলামিইয়াহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৬৫হি.), ১/২৩৯।

৯. তিরমিযী হা/৩০৯৫; ছহীহাহ হা/৩২৯৩; সনদ হাসান।

জবাবদিহিতা : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের অন্যতম ভিত্তি

-মামুন বিন হাশমত*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় করণীয়

১. তাকুওয়া ও পরকালীন হিসাব-নিকাশের চেতনা সৃষ্টি : একটি আদর্শ সমাজ গড়ার প্রাথমিক শর্ত হ'ল মানুষের হৃদয়ে আল্লাহীতি এবং আখেরাতের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, একদিন মহান রবের সামনে তাকে প্রতিটি কাজের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অন্যায়, দুর্নীতি ও খেয়ানত থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ**, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি লক্ষ্য করুক, সে আগামী দিনের জন্য কি প্রেরণ করেছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত' (হাশর ৫৯/১৮)।

২. ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও মূল্যবোধ জাহত করা : সমাজে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হ'ল ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটানো। মানুষ যখন কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অর্জন করবে, তখনই তাদের মধ্যে হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় এবং আমানতদারিতার প্রকৃত উপলব্ধি তৈরি হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরে ইসলামী নৈতিকতা ও পরকালীন হিসাব-নিকাশের ভয় জাহত করতে পারলে, সমাজ থেকে দুর্নীতি, প্রতারণা ও অধিকার হরণের মতো দুষ্কৃত্যগুলো দূর হয়ে যাবে। কিন্তু আজকের ধর্মহীন সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থার দরুন শিক্ষিতরাই সবচেয়ে বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত ও নিজেদের জবাবদিহিতার উর্ধ্বে মনে করেন।

৩. পরিবারে সততার বীজ বপন করা : পরিবার হ'ল সমাজ সংস্কারের মূল পাঠশালা। একটি শিশু তার ঘর থেকেই ন্যায়-অন্যায় ও দায়বদ্ধতার প্রথম পাঠ গ্রহণ করে। পরিবারে এই চর্চা না থাকলে একটি আদর্শ সমাজ কল্পনা করা যায় না। তাই সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই সততার চর্চা শেখানো অত্যন্ত যরুরী। অভিভাবকরা প্রতিদিন সন্তানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে তাদের সারাদিনের কাজের একটি সাধারণ হিসাব নিতে পারেন। যেহেতু সন্তানরা বাবা-মায়ের আমানতদারিতা দেখেই শেখে, তাই অভিভাবকদের নিজেদের লেনদেন ও আচরণেও পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখা অপরিহার্য।

৪. আমানতদারিতার চর্চা : অর্পিত দায়িত্বকে সর্বোচ্চ বিশ্বস্ততার সাথে পালন করার নির্দেশ দেয় ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا**, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন, তোমরা আমানত যথাযথভাবে তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দাও' (নিসা ৪/৫৮)। এই আয়াতের শিক্ষাকে ধারণ করে, কর্মক্ষেত্রে নিজের পদ

বা দায়িত্বকে নিছক চাকরী না ভেবে আমানত হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজের বিবরণী সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি, দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে নিজের কাজের দায়ভার নিতে শেখাটা একজন সংকর্মীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৫. নিয়মিত আত্মসমালোচনা করা : নিজের ভেতরের সংস্কারকে জাহত রাখতে নিয়মিত আত্মসমালোচনা বা মুহাসাবার কোন বিকল্প নেই। মানুষ নিজের ভুল-ত্রুটি পর্যালোচনা করলে আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। ওমর (রাঃ) বলেন, **حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَحْسَبُوا، وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنَ عَلَيْكُمْ**, 'তোমাদের হিসাব নেওয়ার আগে তোমরা নিজেদের হিসাব গ্রহণ কর এবং তোমাদের আমল ওয়ন করার আগে নিজেদের আমল ওয়ন কর'।^১ এই নির্দেশনার আলোকে, প্রতিদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে অন্তত ৫ মিনিট সময় নিয়ে নিজের সারাদিনের কাজের হিসাব মেলানোর একটি রুটিন তৈরি করা যেতে পারে। যেখানে কেউ দেখছে না, সেখানেও আল্লাহ আমাদের দেখছেন এই বিশ্বাস নিজের ভেতরে বদ্ধমূল করতে পারলেই ব্যক্তিজীবন পরিসুদ্ধ হবে।

৬. সংকাজের আদেশ ও অসংকাজ থেকে বিরত রাখার পরিবেশ সৃষ্টি করা : সমাজে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক উপদেশ, সংকাজের আদেশ এবং অসংকাজ থেকে বিরত রাখার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ**, 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা আবশ্যিক, যারা সংকাজের আদেশ দিবে ও অসংকাজে নিষেধ করবে। আর তারাই হ'ল সফলকাম' (আলে-ইমরান ৩/১০৪)।

৭. স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার না করা : ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল স্বজনপ্রীতি (Nepotism) এবং যোগ্যতার অবমূল্যায়ন। বর্তমান সময়ে নিয়োগবাণিজ্য, রাজনৈতিক দলীয়করণ এবং যোগ্য ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে আত্মীয় বা অনুগতদের পদায়নের যে মহামারী আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা মূলত স্বজনপ্রীতির চূড়ান্ত রূপ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্ষমতার এই অপব্যবহার ও সামাজিক অবক্ষয়ের বিষয়ে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, **إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَهُ وَأُمُورًا تُنْكَرُ وَنَهَاهَا**, 'আমার পরে তোমরা অবশ্যই স্বজনপ্রীতিকে প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করবে এবং এমন কিছু বিষয় দেখতে পাবে, যা তোমরা পসন্দ করবে না'।^২

বর্তমানে আমরা এই হাদীছের বাস্তব চিত্র দেখতে পাচ্ছি। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মেধা ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরও কেবল লবিং বা 'ক্ষমতাশালী আত্মীয়' না

১. মুহাম্মাদ ইবনু আলী জামীল আল-মুতারী, তাহযীর কুতুব-যুহদিল মুসনাদাহ ১/৪১।

২. বুখারী হা/৭০৫২; তিরমিযী হা/২১৯০।

* লাউবাড়িয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

খাকার কারণে বহু যোগ্য ব্যক্তিকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো যেন কিছু নির্দিষ্ট সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর পৈতৃক সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। একদিন জনৈক আনছার ছাহাবী রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করল এবং বলল আপনি অমুককে যেভাবে কর্মচারী নিযুক্ত করেছেন, সেভাবে আমাকেও কি কর্মচারী নিয়োগ করবেন না? তখন তিনি বললেন, *إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي*, 'আমার পরে তোমরা অর্থাৎ *أَثَرُهُ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ*, অনেক পক্ষপাতিত্ব দেখবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, যে পর্যন্ত না তোমরা হাউয (কাওছার)-এ আমার সাথে মিলিত হও'।^{১০} অতএব জবাবদিহিতামূলক ও ন্যায্যভিত্তিক সমাজ গড়তে হলে প্রশাসন ও নেতৃত্বের সর্বস্তরে স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার কঠোরভাবে বন্ধ করে কেবল আমানতদারিতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

৮. স্বচ্ছতা ও পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ : ইসলামে স্বেচ্ছাচারিতা বা একনায়কত্বের কোন স্থান নেই। রাষ্ট্র, সমাজ বা পরিবারের যেকোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এককভাবে না নিয়ে পারস্পরিক পরামর্শ বা শূরা-এর ভিত্তিতে গ্রহণ করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ছাহাবীদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ*, 'আর তুমি কাজেকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর' (আলে-ইমরান ৩/১৫৯)।

যখন কোন সিদ্ধান্ত গোপনে নেওয়া হয়, তখনই সেখানে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অধিকার হরণের সুযোগ তৈরি হয়। কোন প্রকল্প কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, সরকারী বা প্রাতিষ্ঠানিক তহবিল কিভাবে ব্যয় হচ্ছে এবং কাদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে তা সংশ্লিষ্ট সকলের জানা উচিত। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় যখন স্বচ্ছতা থাকে এবং বিজ্ঞ, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, তখন সেখানে ক্ষমতার অপব্যবহার বাসা বাঁধতে পারে না। এতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।

৯. বৈষম্যহীন বিচারব্যবস্থা চালু করা : সমাজে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত হ'ল দল, মত, নির্বিশেষে সকলের জন্য আইনের সমান প্রয়োগ নিশ্চিত করা। যেখানে ক্ষমতালোভীরা আইনকে পাশ কাটিয়ে যায় এবং কেবল দুর্বলদের ওপর আইন প্রয়োগ করা হয়, সেখানে প্রকৃত জবাবদিহিতা কখনোই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ইসলাম আইনের সমান প্রয়োগের ব্যাপারে আপসহীন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَوْ الظَّالِمِينَ إِنَّا بَعْدَ ذَلِكَ عَلِيمٌ*, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হোক বা গরীব হোক, আল্লাহ তাদের সর্বাধিক শুভাকাঙ্ক্ষী' (নিসা ৪/১৩৫)। একবার অভিজাত মাখযুমী গোত্রের জনৈক নারী চুরি করলে কেউ কেউ তার শাস্তি

মওকুফের জন্য রাসুল (ছাঃ)-এর কাছে সুপারিশ করেন। এতে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করত, তখন তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম'।^{১১}

আজকের বিচারব্যবস্থায় অর্থ ও ক্ষমতার বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। আবার অনেকেই মিথ্যা মামলার আসামী হয়ে বছরের পর বছর জেলের ঘানি টানছেন। যদি দেশে ইসলামী বিচারব্যবস্থা চালু থাকত তাহলে জবাবদিহিতার পরিবেশ ফিরে আসত এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করত। তাই বিচারব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত এবং নিরপেক্ষ রেখে 'আইনের চোখে সবাই সমান এবং কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়' এই নীতির বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০. দায়িত্বশীল নেতৃত্ব সৃষ্টি করা : সাধারণ মানুষ বা অধীনস্থরা সর্বদা তাদের নেতাদের অনুসরণ করে। সমাজের শীর্ষ পর্যায়ে থাকা ব্যক্তিরা যদি দুর্নীতিগ্রস্ত বা দায়িত্বহীন হন, তবে কোন আইন বা শাস্তি দিয়েই অধঃস্তনের সংশোধন করা সম্ভব নয়। ওমর (রাঃ) যখন জনগণকে কোন বিষয়ে নিষেধ করতেন, তখন তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের একত্রিত করে বলতেন, 'আমি জনগণকে অমুক কাজ থেকে নিষেধ করেছি। মানুষ তোমাদের দিকে সেভাবে তাকিয়ে থাকে, যেভাবে পাখিরা গোশতের দিকে তাকিয়ে থাকে। আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ঐ নিষিদ্ধ কাজ করে, তবে আমি তাকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করব'।^{১২} বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বকে কেবল মৌখিক নির্দেশনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, নিজেদের কাজের মাধ্যমে সততা ও স্বচ্ছতার প্রমাণ দিতে হবে। একজন জনপ্রতিনিধি, প্রশাসক বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান যখন নিজের সম্পদের হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন এবং নিজের ভুল স্বীকার করার মানসিকতা দেখাবেন, তখন তার অধীনস্থরাও জবাবদিহিতার চর্চা করতে বাধ্য হবে।

উপসংহার : জবাবদিহিতা সুদৃঢ় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সুস্থ সমাজ কাঠামোর জীবনীশক্তি। মানব ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, যখনই কোন সমাজ বা সভ্যতা থেকে এই দায়বদ্ধতার চেতনা হারিয়ে গেছে, তখনই সেখানে শোষণ, বৈষম্য ও পতনের সূচনা হয়েছে। ইসলামের নির্দেশিত জবাবদিহিতার এই বহুমাত্রিক মডেল যেভাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে আল্লাহর নয়রদারীর সূতোয় বেঁধে রাখে তা যেকোন আধুনিক সুশাসনের কাঠামোর চেয়েও অনেক বেশী কার্যকর। তাই আসুন! একটি ন্যায্যভিত্তিক ও টেকসই সমাজ বিনির্মাণে অন্যের দিকে আঙুল তোলার আগে নিজেদের কাজের হিসাব মেলাতে শিখি। কারণ ব্যক্তির আত্মবুদ্ধি এবং প্রতিটি স্তরের দায়িত্বশীলতাই পারে একটি আদর্শ, দুর্নীতিমুক্ত ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রকাঠামোর জন্ম দিতে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

৪. বুখারী হা/৩৪৭৫; মুসলিম হা/১৬৮৮।

৫. মুসান্নাফ আব্দুর রায়যাক ১১/২০৭১৩; ছহীহাহ হা/৩৬২।

৩. মুসলিম হা/৪৬৭৩; তিরমিযী হা/২১৮৯।

ডেঙ্গু মহামারী : ঈমান ও মানবিক দায়িত্ব

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রার পাশাপাশি চিকিৎসাবিজ্ঞান অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করলেও অদৃশ্য ইশারায় এমন সব নতুন নতুন রোগব্যাদির উদ্ভব হচ্ছে, যা মানব জীবনের জন্য এক গভীর অশনিসংকেত। ডেঙ্গু তেমনই এক মশাবাহিত রোগ, যা কেবল মানুষের দেহকেই দুর্বল করে না, বরং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপরও সৃষ্টি করে বহুমাত্রিক স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক অভিঘাত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যের জন্য ডেঙ্গু বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপ, পরিবারের উদ্বেগ-উৎকর্ষা, চিকিৎসাব্যয়ের বোঝা এবং প্রিয়জন হারানোর বেদনা-সব মিলিয়ে ডেঙ্গু এখন শুধু একটি চিকিৎসাবিষয়ক সমস্যা নয়; এটি একটি সামাজিক ও মানবিক সংকটের রূপ ধারণ করেছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত চলতি বছরে দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৫৫ হাজার ছাড়িয়েছে এবং মৃত্যুর সংখ্যা ১৬৮তে পৌঁছেছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম ১৩ দিনে আক্রান্ত হয়েছে ১৫ হাজার ৯৯১ জন, মৃত্যু হয়েছে ৫২ জনের। অথচ পুরো আগস্ট মাসে আক্রান্ত হয়েছিল ২০ হাজার ৫৩৬ জন। মারা গেছে ৪৩ জন। এর আগের মাস জুলাইয়ে আক্রান্ত হয়েছিল ৯ হাজার ২০৬ জন এবং মারা গেছে ৩৬ জন (কালের কণ্ঠ)। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত আক্রান্ত রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অক্টোবরে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন। উল্লেখ্য, এই পরিসংখ্যান কেবলমাত্র কিছু সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রতিটি সংখ্যার পেছনে রয়েছে একটি পরিবার, মা-বাবা, সন্তান, স্বজন, একটি কর্মজীবন এবং কখনো কখনো একটি অপূরণীয় শূন্যতা।

প্রশ্ন হচ্ছে-কেন জনপদের ওপর বারবার বিপর্যয় নেমে আসে? কেন বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ রোগব্যাদি মহামারীর আকার ধারণ করে মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে? এমন পরিস্থিতিতে একজন মুসলমানের ঈমানের দৃঢ়তা কেমন হওয়া উচিত? একই সঙ্গে একজন মানুষ হিসাবে সমাজ ও মানবতার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতাই বা কতটুকু? এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করাই হবে আলোচ্য নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

যেভাবে শুরু : ডেঙ্গু মহামারী আকারে প্রথম দেখা দেয় ১৭৮০ সালে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়াতে। অতঃপর উনিশ শতকে ও বিশ শতকের প্রথম দিকে ডেঙ্গুজ্বরের মহামারী ঘটে আমেরিকা, দক্ষিণ ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়াতে। ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও ক্যারিবিয়ান সাগরের কিছু কিছু দ্বীপেও ডেঙ্গুর সন্ধান মেলে। তবে এইসব ডেঙ্গু প্রাণঘাতী ছিল না। পরবর্তীতে হেমোরজিক বা রক্তক্ষরণজনিত প্রাণঘাতী ডেঙ্গুজ্বর (DHF) প্রথম মহামারী আকারে দেখা দেয় ১৯২২ সালে আমেরিকার টেক্সাস ও লুইসিয়ানা নগরীতে। ১৯৮১

সালে কিউবাতে এবং ১৯৮৯ সালে ভেনেজুয়েলাতেও এই জ্বর মহামারী আকারে দেখা দেয়। তবে ডেঙ্গু হেমোরজিক ফেভার সবচেয়ে বেশী হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' (WHO)-এর হিসাব মতে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত এই রোগে এই অঞ্চলে আক্রান্ত হয়েছে ৭ লাখ ৯৬ হাজার ৩৮৬ জন এবং মারা গেছে ৯ হাজার ৭৭৪ জন। ১৯৯৭ সালে নয়াদিল্লীতে ডেঙ্গুজ্বর ভয়াবহরূপে দেখা দেয়। যাতে ৩০ হাজার লোক আক্রান্ত হয় এবং সহস্রাধিক লোক মারা যায়। ঢাকায় প্রথম ডেঙ্গুজ্বর দেখা দেয় ১৯৬৪ সালে। অতঃপর ১৯৭৭-৭৮ সালে পুনরায় দেখা দেয়। তবে এগুলি ছিল সামান্য আকারে। তখন একে 'ঢাকা ফেভার' বলা হ'ত। অতঃপর ১৯৯৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে যখন ঢাকায় হঠাৎ করে ডেঙ্গুজ্বরে দুই তরফ মারা যায়, তখন সরকারের টনক নড়ে। ঢাকা মহানগরীকে ২৩টি জোনে ভাগ করে ২১টিতেই ডেঙ্গু স্ত্রী জাতীয় এডিস মশার উপস্থিতি পাওয়া যায়। এরপরে ১৯৯৮ সালের জুলাই-আগস্টে ভয়াবহ বন্যার পরপরই 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা'র পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে ডেঙ্গুজ্বর সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়। অতঃপর ২০০০ সালের জুন মাস থেকে ডেঙ্গু মহামারী আকারে ঢাকা মহানগরীকে ঘাস করে। সেই সাথে সারা দেশে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে (সূত্র : আত-তাহরীক)।

কারণ : কেন জনপদের ওপর বারবার বিপর্যয় নেমে আসে? এ প্রশঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হচ্ছে- 'মানুষের কৃতকর্মের ফলে স্থলে ও জলে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের কিছু কৃতকর্মের শাস্তি আন্বাদন করাতে চান, যাতে তারা (আল্লাহর দিকে) ফিরে আসে' (রুম ৩০/৪১)। অর্থাৎ মানুষের অন্যায় কর্ম সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনে। মানুষ আক্রান্ত হয় নানাবিধ এলাহী গযবে। যদিও ইসলাম বারংবার মানুষকে তওবা, ন্যায়বিচার, সংকাজ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে আসছে। কিন্তু মানুষ সেদিকে দ্রষ্টব্য না করে বরং প্রতিনিয়ত পাপের সাগরে আকর্ষণ নিমজ্জিত হচ্ছে। ফলে এলাহী নির্দেশে আসমানী বালা-মুহীবতও বিভিন্ন নামে নতুন নতুন রূপে আক্রমণ করছে। সূতরাং এ কথা বলাবল্য যে, মানুষের পাপ যত বৃদ্ধি পাবে, বালা-মুহীবতও সেভাবে বৃদ্ধি পাবে। পাপের প্রকৃতি যত পরিবর্তন হবে, গযবের প্রকৃতিও তেমনি পরিবর্তিত হবে। একসময় কলেরা, ম্যালেরিয়া, গুটি বসন্ত, যক্ষ্মা, ধনুষ্টিংকার, কুষ্ঠরোগ ইত্যাদি রোগে মানুষ আতঙ্কিত থাকত। এ সবার স্থান এখন দখল করেছে করোনা, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ আধুনিক সব রোগব্যাদি। আর এ সবই পরিকল্পিতভাবে বিশ্বপালক মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নির্দেশেই আসে। যেমন তিনি বলেন, 'পৃথিবীতে বা তোমাদের জীবনে এমন কোন বিপদ আসে না, যা তা সৃষ্টির পূর্বে আমরা কিতাবে লিপিবদ্ধ করিনি' (হাদীদ ৫৭/২২-২৩)।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। (১) যখন কোন জাতির মধ্যে

প্রকাশ্যে অশ্রীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব রোগের উদ্ভব হয়, যা পূর্বকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। (২) যখন কোন জাতি ওয়ন ও পরিমাপে কম দেয়, তখন সে জাতি দুর্ভিক্ষ, খাদ্য-সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হয়। (৩) যে জাতি তাদের মালের যাকাত দেওয়া বন্ধ করে দেয়, সে জাতির জন্য আকাশ হ'তে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি অন্যান্য প্রাণীকুল না থাকত, তাহ'লে তাদের জন্য আদৌ বৃষ্টি হ'ত না। (৪) যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দূশমনকে ক্ষমতাশীল করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়। (৫) যখন শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা না করে এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ না করে, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন।^১

প্রিয় পাঠক! আমরা বা দেশের সরকার ও প্রশাসনের কোন কর্তা ব্যক্তি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো যে, উক্ত অপরাধগুলো থেকে আমরা মুক্ত আছি বা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে মুক্ত রাখতে পারছি। বরং উপরোক্ত অপরাধগুলোর সবই প্রায় সে যুগের তুলনায় এ যুগে আরো ব্যাপকহারে চালু আছে এবং আরো আধুনিক ও ডিজিটাল ফরমেটে দোদারসে চলছে। সুতরাং আমরা কি করে আশা করতে পারি যে, আমাদের উপরে আসমানী বালা-মুছীবত নেমে আসবে না। অতএব এলাহী গযব থেকে বাঁচতে আমাদের তওবা করা এবং নেক আমল বৃদ্ধি করা ছাড়া কোন গতান্তর নেই।

ঈমানী দৈন্যতা: এক্ষণে মহামারী দেখা দিলে আমাদের ঈমানের হাল-হকিকত কেমন হয় সেদিকে একটু নয়র দেয়া যাক। আমরা যেহেতু জেনেছি যে, মহামারী ছোঁয়াচে রোগ, সেকারণ এ থেকে বাঁচা তথা মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য আমরা কমবেশী সকলেই আশ্রয় চেষ্টা করি। কিন্তু এজন্য কিছু মানুষের নিষ্ঠুরতা জাতিকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। কোভিড-১৯ যে যেটা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আক্রান্ত ব্যক্তি যত নিকটাত্মীয়ই হোন না কেন তার থেকে দূরে থাকা, তার সেবা না করা, জানাযা ও কাফন-দাফনে শরীক না হওয়া, লাশ ফেলে পালিয়ে যাওয়া, বৃদ্ধা মাকে জঙ্গলে ফেলে আসার মত লোমহর্ষক ঘটনাও ঘটেছে সেসময়। সকলের মধ্যে যেন বাঁচার এক মর্মস্পর্শী আকুতি। কবির ভাষায়-

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই!

আমাদের ঈমানের দৈন্যতা এতটাই তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে যে, আমরা ভাইরাসকেই যেন হায়াত-মওতের মালিক ধরে নিয়েছি। সেকারণ ভাইরাস থেকে পালানোর জন্য ব্যস্ত, কিন্তু আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল আমাদের কোথায়? তবে কি

আমরা বেমানুম ভুলে গেছি যে, ভাইরাসের যিনি স্রষ্টা তিনি আমারও স্রষ্টা। তিনি মায়ের পেটে ১২০ দিন বয়সে আমার আয়ুষ্কাল লিখে দিয়েছেন (বুখারী হ/৩২০৮)। আমার তাকদীর পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগে লেখা হয়েছে (মুসলিম হ/২৬৫৩)। সুতরাং আমাকে ক্ষতি করার ভাইরাসের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। সে যতই ছোঁয়াচে হোক মহান রবের ইশারা ব্যতীত সে আমাকে স্পর্শ করার অধিকার রাখে না। আল্লাহ যদি চান এই ভাইরাসের আক্রমণে আমার মৃত্যু হবে তবেই আমার মৃত্যু হবে। মহান আল্লাহ না চাইলে পৃথিবীর কোন শক্তি নেই, যে আমাকে মারতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে চেষ্টা করলেও আমার কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না (তিরমিযী, মিশকাত হ/৫৩০২)। ঈমানের এই দৃঢ়তা আমাদের কোথায়? যার অভাবে আজ আমরা দিশেহারা হয়ে দিগ্বিদিক ছুটছি। মানবিকতার লেবাস পরে অমানবিক হয়ে ওঠেছি। এতএব যেকোন মূল্যে আমাদেরকে ঈমানী দৈন্যতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বিপদে ঈমান না হারিয়ে বরং ঈমানকে আরো দৃঢ় ও ময়বুত করতে হবে।

করণীয় : মহামারী দেখা দিলে ঈমানী দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের করণীয় হচ্ছে- (১) আতঙ্কিত না হয়ে ধৈর্যধারণ করা। কেননা বিপদাপদ একদিকে যেমন কৃতকর্মের ফল, অপরদিকে তেমনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। আল্লাহ বলেন, 'আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যাদের কোন বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকেই ফিরে যাব' (বাক্বারাহ ২/১৫৫-১৫৭)। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্লেগ মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি একটি আযাব। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা করেন তার উপর এটি প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য এটাকে 'রহমত' স্বরূপ করেছেন। ফলে কোন ব্যক্তি যদি মহামারী এলাকায় ধৈর্যের সাথে ও ছওয়াবের আশায় অবস্থান করে এবং হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তাই হবে, তবে সে একজন শহীদদের মর্যাদা লাভ করবে' (বুখারী হ/৩৪৭৪)।

(২) তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখা। আল্লাহ বলেন, 'যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কোন কল্যাণ চান, তবে তার অনুগ্রহকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশী তিনি তা দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (ইউনুস ১০/১০৭)। তিনি স্বীয় রাসুলকে বলেন, 'তুমি বল, আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহর উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত' (তওবা ৯/৫১)। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) ইবনু আববাস (রাঃ)-কে বলেন, 'যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহর নিকটেই চাইবে। আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে,

১. ইবনু মাজাহ হ/৪০১৯, ছহীহাহ হ/১০৬, ৪০০৯, সন্দ হাসান।

তখন আল্লাহর টিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করবে। জেনে রাখ, যদি উম্মতের সবাই তোমার কোন উপকারের জন্য একত্রিত হয়, তারা তোমার কোন উপকার করতে সক্ষম হবে না অতটুকু ব্যতীত, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি সবাই তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, তবে কেবল অতটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন...।^১

(৩) কৃত পাপ থেকে তওবা করা ও অধিকহারে নেক আমলে ব্রতী হওয়া। হাদীছে ঘোষিত যে সকল পাপের কারণে আসমানী গণ্য নেমে আসে, সে সকল পাপ থেকে খাঁটি তওবা করা এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা। উল্লেখ্য যে, তওবা হচ্ছে- কৃত পাপ বর্জন করা, ঐ পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে আর কখনো ঐ পাপে না জড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া। এই তিনটি শর্ত পূরণ হলে তবে একে কুরআনে ঘোষিত ‘তওবায় নাহুহা’ বা খাঁটি তওবা বলে। সেই সাথে বেশী বেশী নেক আমল করতে হবে। ফরযের পাশাপাশি নফল ইবাদতে অভ্যস্ত হবে হবে। আখলাকে হাসানার অধিকারী হতে হবে। কারো প্রতি যুলুম-নির্যাতন করা যাবে না। যেনার সকল উপসর্গ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে সততার স্বাক্ষর রাখতে হবে। মাপে ও ওয়নে ন্যায্যনীতি বজায় রাখতে হবে। যাকাত আদায় ও দান-ছাদকায়াও অগ্রগামী হতে হবে। তবেই আমাদের উপর আসমানী গণ্যের পরিবর্তে আসমানী মদদ নেমে আসবে ইনশাআল্লাহ।

মানবিক দায়িত্ব : ডেঙ্গু মহামারীতে নিজেদের সুরক্ষার পাশাপাশি আমাদের কিছু মানবিক দায়িত্ব রয়েছে। যেমন- আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারের পাশে দাঁড়ানো। আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা। রোগীকে অবহেলা বা সামাজিকভাবে হেয় না করে মানসিকভাবে সাহস জোগানো। তার চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করা। প্রয়োজনীয় রক্তের ব্যবস্থা করতে সহযোগিতা করা এবং সম্ভব হলে নিজে রক্ত দেওয়া। মশার বংশবিস্তার রোধ তথা প্রজননস্থল ধ্বংস করা। নিজের বাড়ি ও আশপাশের জমে থাকা পানি পরিষ্কার করা এবং অন্যদেরও এ কাজে উৎসাহিত করা। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা। ডেঙ্গু সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রচার করা এবং গুজব বা ভ্রান্ত ধারণা ছড়ানো থেকে বিরত থাকা। হাসপাতাল, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্থানীয় উদ্যোগে সামর্থ্য অনুযায়ী অসহায় রোগীদের সহায়তায় এগিয়ে আসা। এককথায় ডেঙ্গুর মতো সংকটে মানবিক দায়িত্ব হলো- নিজেকে সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি অন্যের জীবন রক্ষায় সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে এগিয়ে আসা।

সরকারের দায়িত্ব : ডেঙ্গু বা যেকোন মহামারীতে সরকারের দায়বদ্ধতা অনেক বেশী। জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। এ জন্য সরকারের রয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্যবিষয়ক মন্ত্রণালয়। তাছাড়া প্রত্যেক যেলাতে রয়েছে যেলা প্রশাসন, সিটির মধ্যে

রয়েছে সিটি কর্পোরেশন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বছরের পর বছর ধরে চলা মশাবাহিত এই মহামারীর উৎস ‘এডিস মশা’ নিয়ন্ত্রণে সরকারের কার্যকর কোন পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না। অতীতে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে সিটিতে বা যেলা প্রশাসনের উদ্যোগে যেলা সদরে ফগার মেশিনে ঔষধ স্প্রে করার মাধ্যমে মশা নিধনের ব্যবস্থা থাকলেও ইদানিং তেমন একটা চোখে পড়ে না। ফলে প্রত্যেকটা শহর যেন এখন মশার নিরাপদ নগরীতে পরিণত হয়েছে। এ খাতের বাজেট কোথায় যায়? কোন সাধু ব্যক্তির তা হয়ম করেন সংশ্লিষ্টরাই বলতে পারবেন। আমরা সাদা চোখে যা দেখি তাই বলছি। সুতরাং ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারের উল্লেখযোগ্য করণীয়গুলো হচ্ছে-

১. মশা নিয়ন্ত্রণ : নিয়মিত ও বৈজ্ঞানিকভাবে মশার প্রজননস্থল শনাক্ত ও ধ্বংস করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী লার্ভা ও পূর্ণবয়স্ক মশা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া। **২. পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা :** জলাবদ্ধতা, পরিত্যক্ত পাত্র, নির্মাণাধীন ভবনসহ যেসব স্থানে পানি জমে মশা জন্মাতে পারে, সেগুলো নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া। **৩. চিকিৎসাব্যবস্থা শক্তিশালী করা :** সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত শয্যা, চিকিৎসক, নার্স, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-সামগ্রী নিশ্চিত করা। **৪. দ্রুত রোগ শনাক্তকরণ :** রোগের বিস্তার পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা দ্রুত শনাক্ত করা। **৫. জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা :** ডেঙ্গুর লক্ষণ, সতর্কতা, কখন চিকিৎসা নিতে হবে এবং কীভাবে মশার প্রজনন রোধ করা যায়-এসব বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রচার করা। **৬. যরুরী সহায়তা ও সমন্বয় :** স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, সিটি করপোরেশন, হাসপাতাল ও অন্যান্য সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় করা এবং চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করা। **৭. ঔষধ ও চিকিৎসা-সামগ্রীর সহজলভ্যতা :** প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-সামগ্রী ও পরীক্ষার উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সংকটের সুযোগে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া প্রতিরোধ করা। **৮. দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের সুরক্ষা :** যাদের চিকিৎসার ব্যয় বহন করা কঠিন, তাদের জন্য সরকারি সহায়তা ও সহজলভ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

শেষ কথা : ডেঙ্গু আমাদের সামনে এমন একটি দর্পণ, যে দর্পণে শুধু রোগীর সংখ্যা নয়, দেখা যায় আমাদের সচেতনতা, আমাদের পরিচ্ছন্নতা, আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ববোধ এবং আমাদের ঈমানের বাস্তব অবস্থা ও প্রয়োগ। ডেঙ্গু স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের জীবনের ভুল-ভ্রান্তি ও কৃত সব অপরাধের কথা। একটি পরিচ্ছন্ন ঘর যেমন একটি পরিবারের নিরাপত্তা বাড়ায়, তেমনি হাযারো পরিচ্ছন্ন ও দায়িত্বশীল পরিবার একটি নিরাপদ সমাজ গড়ে তুলতে পারে। মানুষের জীবন রক্ষা, বিপদগ্রস্তের পাশে দাঁড়ানো, প্রতিবেশীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পৃথিবীকে পরিচ্ছন্ন রাখা-এসবই একজন মুমিনের দায়িত্বশীল জীবনের অংশ। তাই ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই হোক জ্ঞান ও সচেতনতার, পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলার, সহমর্মিতা ও মানবিকতার এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রত্যয়ে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন-আমীন!!

আদর্শ সন্তান গঠনে পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা এবং উত্তরণের উপায়

—মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম*

ভূমিকা :

প্রতিটি শিশু নিষ্পাপ অবস্থায় এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। তার চরিত্র, মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রথম ভিত্তি পরিবারে রচিত হয়। এরপর বিদ্যালয়, বন্ধু, সমাজ ও পরিবেশ তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং একটি শিশুর ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করে সে কি ধরনের শিক্ষা, আদর্শ ও পরিবেশে বেড়ে উঠছে তার উপর। বর্তমান সময়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অবহেলা, প্রযুক্তির অপব্যবহার, পারিবারিক অস্থিরতা, অসৎ সঙ্গ এবং অভিভাবকদের কিছু ভুলের কারণে অনেক শিশু আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ সন্তানের ভরণ-পোষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি তার ঈমান, আখলাক, শিষ্টাচার, দায়িত্ববোধ ও আল্লাহভীতি গড়ে তোলাও পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আলোচ্য প্রবন্ধে শিশুদের আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়, সেগুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

১. জীবনসঙ্গী নির্বাচনে দ্বীনদারীকে গুরুত্ব না দেওয়া :

আদর্শ সন্তানের বীজ রোপিত হয় আদর্শ পরিবারে। আর সেই পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হ'ল একজন দ্বীনদার মা। কিন্তু আজ অনেকেই জীবনসঙ্গী নির্বাচনের সময় দ্বীনদারীর চেয়ে সৌন্দর্য, অর্থ-সম্পদ, শিক্ষাগত যোগ্যতা কিংবা সামাজিক মর্যাদাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফলে সংসারে বাহ্যিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও ঈমানী পরিবেশ, ইবাদতের চর্চা ও ইসলামী মূল্যবোধের ঘাটতি দেখা দেয়। এর প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়ে সন্তানের চরিত্র গঠনে। যে ঘরে কুরআন তেলাওয়াতের চেয়ে পর্দার রঙ নিয়ে বেশী আলোচিত হয়, সেখানে সন্তানের হৃদয়ে দ্বীনের ভালবাসা গভীরভাবে শিকড় গাড়া কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) জীবনসঙ্গী নির্বাচনে দ্বীনদারীকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, **تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لَأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا وَحَمَلِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ يَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ،** 'সাধারণত নারীদের চারটি গুণ দেখে বিবাহ করা হয়- তার ধন-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা, সৌন্দর্য এবং দ্বীনদারী। তুমি দ্বীনদারীকে অগ্রাধিকার দাও। অন্যথা তোমার উভয় হস্ত অবশ্যই ধূলায় ধূসরিত হবে'।^১ তিনি অন্যত্র বলেন, 'তোমরা বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন কর এবং সমতা দেখে বিবাহ কর'।^২ একইভাবে পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও দ্বীনদারী ও উত্তম

চরিত্রকে প্রধান্য দিতে নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, **مَنْ تَرَضَّوْنَ، دِينُهُ وَخُلُقُهُ فَرَوْجُهُ،** 'যার দ্বীনদারী এবং উত্তম আচরণে তোমরা সম্মত, তার সাথে বিবাহ দাও'।^৩ তাই আদর্শ সন্তান গঠনের প্রথম পদক্ষেপই হ'ল জীবনসঙ্গী নির্বাচনে দ্বীনদারীকে সর্বাঙ্গে স্থান দেওয়া। কারণ দ্বীনদার পিতা-মাতাই সন্তানের ঈমান, চরিত্র ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ ভিত্তি।

২. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব কম দেওয়া :

আজ অনেক পরিবারে সন্তানের ভবিষ্যৎ বলতে বোঝানো হয় উচ্চ বেতনের চাকরী, গাড়ী-বাড়ী ও অর্থ-সম্পদের নিশ্চয়তা। কিন্তু দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান ও উত্তম চরিত্র গঠনের জন্য আলাদা কোন পরিকল্পনা থাকে না। ফলে সন্তান উচ্চশিক্ষা অর্জন করলেও মূল্যবোধ ও নৈতিকতায় দুর্বল হয়ে পড়ে। সমাজে এমন অনেক শিক্ষিত মানুষ দেখা যায়, যারা পেশাগতভাবে সফল হলেও কথায়, লেনদেনে ও দায়িত্ববোধে ইসলামী চরিত্রের পরিচয় দিতে পারে না। অথচ পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হ'ল সন্তানকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। কেননা **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ، وَهَلْ يُكْمَلُ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ،** 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর' (তাহরীম ৬৬/৬)। তাই সন্তানের জীবনে কেবল দুনিয়াবী সাফল্যের স্বপ্ন নয়, বরং আল্লাহভীতি, সততা ও নৈতিকতার আলো পৌঁছে দেওয়াই প্রকৃত অভিভাবকত্ব।

৩. সন্তানের সামনে নেতিবাচক আচরণ :

শিশু উপদেশের চেয়ে আচরণ থেকে বেশী শিক্ষা নেয়। পিতা-মাতা যদি মিথ্যা বলেন, ওয়াদা ভঙ্গ করেন, রাগে কটু কথা বলেন বা অন্যের সমালোচনাকে স্বাভাবিক বানিয়ে ফেলেন, তবে সন্তানও ধীরে ধীরে সেগুলোকেই জীবনযাত্রার অংশ মনে করতে শুরু করে। কারণ সে এ শিক্ষা বই থেকে নয়, ঘর থেকেই পেয়েছে। সন্তানের সামনে আমাদের প্রতিটি কথা ও আচরণ একেকটি নীরব পাঠ। তাই তাকে ইতিবাচক করতে চাইলে আগে নিজের জীবনকেই ইতিবাচক করতে হবে।

৪. সন্তানের মনে আল্লাহভীতির স্থলে মানুষের ভয় সৃষ্টি করা :

মানুষের চোখকে যে ভয় পায়, সে সুযোগ পেলে অন্যায় করে; কিন্তু আল্লাহকে যে ভয় পায়, সে নির্জনেও নিজেকে সংযত রাখে। অনেক পরিবারে সন্তানকে সংশোধনের জন্য বলা হয়, 'পিতা এলে মারবে', 'স্যার জানলে শাস্তি দেবে' কিংবা 'পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে'। অথচ খুব কমই শেখানো হয়, আল্লাহ সব দেখছেন এবং প্রতিটি কাজের হিসাব একদিন তাঁর নিকটে দিতে হবে। ফলে সন্তানের নৈতিকতা মানুষের উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রকৃত চরিত্র

* কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনাগাঁও।

১. বুখারী হা/৫০৯০; মুসলিম হা/১৪৬৬।

২. ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৬৭।

৩. তিরমিযী হা/১০৮৪; মিশকাত হা/৩০৯০।

গড়ে ওঠে তখনই, যখন সে বিশ্বাস করে কেউ না দেখলেও আল্লাহ তাকে দেখছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **لَمْ يَكُنْ لَكَ دُونَهُ حَافِظٌ وَنَصِيرٌ** 'সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার সব কিছুই দেখেন?' (আলাক্ব ৯৬/১৪)। অন্যত্র তিনি বলেন, **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا** 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষক' (নিসা ৪/১)।

সুতরাং সন্তানের হৃদয়ে যদি আল্লাহভীতি জন্মিত হয়, তবে তাকে পাহারা দেওয়ার জন্য সর্বত্র মানুষ বসানোর প্রয়োজন হবে না। আল্লাহর ভয় তাকে যাবতীয় অন্যায় থেকে বিরত রাখবে।

৫. সন্তানের জন্য আন্তরিকভাবে দো'আ না করা :

সন্তানের পড়াশোনা, চিকিৎসা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা বহু পরিকল্পনা করে থাকি। কিন্তু তার হেদায়াত ও উত্তম চরিত্রের জন্য কতবার আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে দো'আ করেছি? অথচ দুনিয়ার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হ'তে পারে, কিন্তু আল্লাহ দো'আ কবুল করলে একটি মন্দ জীবন মল্লুতেই বদলে যেতে পারে।

যাকারিয়া (আঃ) বার্বাক্য পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন আল্লাহ তা'আলা ফলের মণ্ডসুম ছাড়াই মারিয়াম (আঃ)-কে ফল দান করে রিয়িকের ব্যবস্থা করছেন। তখন তাঁর মনে সন্তানের সুগু আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল, তিনি সাহস পেলেন যে, আল্লাহ বৃদ্ধ দম্পতিকেও সন্তান দিতে পারেন। তাই তিনি আল্লাহর দরবারে দো'আ করলেন, **رَبِّ**

‘هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার পক্ষ হ'তে একটি পুত-চরিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী' (আলে ইমরান ৩/৩৮)। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দো'আ কবুল করে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, **فَنَادَاهُ الْمَلَايِكَةُ**, 'স্বীয় ইবাদত কক্ষে দাঁড়িয়ে প্রার্থনারত অবস্থায় ফেরেশতারা তাকে সম্বোধন করে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন। যিনি হবেন আল্লাহর কালেমা (ঈসা)-র সত্যায়নকারী ও নেতা, কলুষমুক্ত এবং সৎকর্মশীল নবীগণের অন্তর্ভুক্ত' (আলে ইমরান ৩/৩৯)।

ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট একটি নেক সন্তান প্রার্থনা করে বলেছিলেন, **رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ** 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে একটি সুসন্তান দান কর' (ছফফাত ৩৭/১০০)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সহনশীল পুত্র ইসমাইল (আঃ)-কে দান করেন (ছফফাত ৩৭/১০১)। তিনি আরো দো'আ করেছিলেন, **رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ** 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ছালাত কায়েমকারী বানাও এবং আমার সন্তানদের

মধ্য থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা! আমার দো'আ কবুল কর! (ইব্রাহীম ১৪/৪০)।

ইব্রাহীম (আঃ) নিজে ও সন্তানাদিকে শিরক থেকে বাঁচার জন্য বলেছিলেন, **رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ** 'হে প্রভু! এই শহরকে শান্তিময় করে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তানাদিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ' (ইব্রাহীম ১৪/৩৫)। আল্লাহ তাঁর দো'আ কবুল করেছিলেন। ফলে মক্কা থেকে মূর্তিপূজা দূরীভূত হয় এবং মক্কা নগরী আল্লাহর নে'মতে পরিপূর্ণ হয়ে শান্তির নগরীতে পরিণত হয়।^৪ আল্লাহ তা'আলা নেক পরিবার ও চক্ষু শীতলকারী সন্তান চাওয়ার ব্যাপারে এ দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন, **رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا**, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষু শীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের নেতা বানাও' (ফুরকান ২৫/৭৪)।

আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-এর জন্য আল্লাহর নিকট দো'আ করেছিলেন এভাবে, **أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ** 'আমি আলামীর কাছ থেকে তাঁর পরিপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং বদনয়র হ'তে আশ্রয় চাচ্ছি'।^৫

রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তিন ব্যক্তির দো'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না... এর মধ্যে একজন হ'লেন সন্তানের জন্য পিতার দো'আ'।^৬ যে ঘরে সন্তানের জন্য নিয়মিত আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা হয়, সে ঘরে শুধু সন্তান নয় একটি প্রজন্মের ভবিষ্যৎও আল্লাহর রহমতে আলোকিত হ'তে পারে।

৬. মোবাইলকে অভিভাবকের বিকল্প বানিয়ে ফেলা :

আজ অনেক পরিবারে শিশুকে ব্যস্ত, শান্ত বা খাওয়ানোর সহজ উপায় হিসাবে তার হাতে মোবাইল তুলে দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে এটি অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। ফলে সে পরিবার, বই, খেলাধুলা ও বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরে গিয়ে ভার্চুয়াল জগতের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অথচ শিশুর প্রকৃত প্রয়োজন মোবাইল নয়; বরং অভিভাবকের সময়, স্নেহ ও সান্নিধ্য।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) নির্দেশনা ও বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, শিশুদের অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত স্ক্রিন ব্যবহারের সঙ্গে ঘুমের ব্যাঘাত, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা, মনোযোগের সমস্যা এবং ভাষা ও সামাজিক দক্ষতার বিকাশে নেতিবাচক প্রভাবের সম্পর্ক রয়েছে। তাই শিশুকে মোবাইল দিয়ে ব্যস্ত রাখার পরিবর্তে তার সঙ্গে কথা বলা, বই পড়া, খেলাধুলা করা এবং পারিবারিক সময় কাটানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। একই

৪. ইবনু কাছীর, বাক্বারাহ ২/১২৬; ইব্রাহীম ১৪/৩৫-৩৬ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ

৫. বুখারী হা/৩৩৭১।

৬. তিরমিযী হা/১৯০৫; আবুদাউদ হা/১৫৩৬।

সঙ্গে অভিভাবকদেরও সন্তানের সামনে অপ্রয়োজনীয় মোবাইল ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ সন্তানকে যে অভ্যাস শেখাতে চাই, তার প্রথম অনুশীলন অভিভাবককেই করতে হয়। নিজে যে আদর্শ অনুসরণ করি না, তা সন্তানের মধ্যে স্থায়ীভাবে গড়ে তোলা কঠিন।

৭. সন্তানের জন্য সময়ের বদলে শুধু অর্থ ব্যয় করা :

একজন পিতা সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় দিন-রাত পরিশ্রম করেন। মাস শেষে নতুন পোশাক, দামী খেলনা, ভাল মোবাইল কিংবা প্রয়োজনীয় সবকিছুই কিনে দেন। কিন্তু সন্তানের পাশে বসে তার দিনের গল্প শোনা, পড়াশোনার খোঁজ নেওয়া, বন্ধুদের পরিচয় জানা কিংবা মনের অবস্থা বোঝার মতো সময় খুব কমই পান। ফলে একসময় সন্তান অভিভাবকের অজান্তেই নিজের মতো করে চলতে শুরু করে। নিজের ইচ্ছামতো বন্ধু বেছে নেয়। কে ভাল আর কে মন্দ সে পার্থক্য বোঝার মতো ক্ষমতাও অনেক সময় হয় না। এভাবে খারাপ সঙ্গের প্রভাবে মিথ্যা বলা, ক্লাস ফাঁকি দেওয়া কিংবা নানা অনৈতিক কাজে সে জড়িয়ে পড়ে। আর তখন একের পর এক অভিযোগ আসতে থাকে অভিভাবকের কাছে।

সুতরাং কেবলমাত্র সন্তানের প্রয়োজন পূরণ করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না; বরং তার পাশে থাকা, তাকে বোঝা, সঠিক পথ দেখানো এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সময় দেওয়াও অভিভাবকত্বের অপরিহার্য অংশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও' (তাহরীম ৬৬/৬)।

৮. অশালীন বিনোদনকে স্বাভাবিক ভাষা :

চোখ যা দেখে, হৃদয় ধীরে ধীরে তাকেই স্বাভাবিক বলে মনে নেয়। পরিবারে কি দেখা হচ্ছে, কি শোনা হচ্ছে এবং কোন বিষয়কে বিনোদন বলা হচ্ছে এসবই শিশুর রুচি ও চরিত্র গঠনে গভীর প্রভাব ফেলে। অশালীন ভাষা, অশোভন দৃশ্য ও অসুস্থ বিনোদনের সঙ্গে নিয়মিত পরিচয় তাকে অজান্তেই লজ্জাহীনতার দিকে ঠেলে দেয়। চরিত্রের অবক্ষয় অনেক সময় শুরু হয় বিনোদনের নামে। তাই বিনোদনের নামে অশ্লীল গান ও নৃত্য এবং যাবতীয় হারাম দর্শন থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র' (নূর ২৪/৩০)। এরপর মুমিন নারীদেরও দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (নূর ২৪/৩১)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'فَرَأَى الْعَيْنَ النَّظْرَ، وَرَأَى اللِّسَانَ الْمُنْطِقَ' 'চোখের যিনা হ'ল দেখা, জিহ্বার যিনা হ'ল কথা বলা...'।^৭

৯. ঘরের অশান্তিকে স্বাভাবিক মনে করা :

স্বামী-স্ত্রীর বাগড়া কখনো শুধু দু'জন মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; তার প্রতিধ্বনি সন্তানের মনেও পৌঁছে যায়। শিশুর কাছে ঘরই নিরাপত্তার প্রথম আশ্রয়। অথচ সেই ঘর যদি

প্রতিদিন রাগ, অপমান ও উচ্চস্বরে তর্কের সাক্ষী হয়, তবে তার মনে ভয় ও অস্থিরতা জন্ম নেয়। ধীরে ধীরে সেই অশান্তির ছাপ পড়ে তার ভাষা, আচরণ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্ক গড়ার পদ্ধতিতেও।

তাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা যথাসম্ভব সন্তানের আড়ালে রেখে শান্তভাবে সমাধান করা উচিত। সন্তান যেন পিতা-মাতার আচরণ থেকেই প্রতিনিয়ত এই শিক্ষা পায় যে, আমার পিতা আমার মাকে সম্মান করেন এবং আমার মাও আমার পিতাকে সম্মান করেন। কারণ পিতা-মাতার পারস্পরিক আচরণই সন্তানের জন্য নীরব অথচ গভীর শিক্ষার মাধ্যম।

ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই পারস্পরিক সম্মান, সহমর্মিতা ও ভালবাসার সঙ্গে দাম্পত্য জীবন পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ' 'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সত্তাবে বসবাস কর' (নিসা ৪/১৯)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي' 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের কাছে উত্তম'।^৮ একইভাবে ইসলাম স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তার বৈধ অধিকার আদায় এবং শরী'আত সম্মত বিষয়ে আনুগত্যের শিক্ষা দিয়েছে। আর এই আনুগত্যের পুরস্কার হ'ল জান্নাত। হুতাইন ইবনু মিহছান (রহ.) হ'তে বর্ণিত, তাঁর এক ফুফু কোন প্রয়োজনে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আসলেন। তিনি তাঁর প্রয়োজনের কথা শেষ করলে নবী করীম (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বিবাহিতা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার স্বামীর প্রতি তোমার আচরণ কেমন? তিনি বললেন, আমি তাঁর ব্যাপারে কোন ক্রটি করি না; তবে যা করা আমার সাধ্যের বাইরে, তা করতে পারি না। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'أَنْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَسْبُكَ وَنَارُكَ' 'তুমি তাঁর প্রতি কেমন আচরণ করছ, তা খেয়াল রেখো। কারণ তিনিই তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম'।^৯

তাই স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসাপূর্ণ আচরণই সন্তানের মনে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে সুন্দর ও ইতিবাচক ধারণা তৈরি করে। ফলে ভবিষ্যতে সেও একটি শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর পরিবার গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে।

স্মর্তব্য যে, একটি শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবার পাওয়া সন্তানের ন্যায্য অধিকার। তাই পিতা-মাতার নিজেদের বিরোধ ও অশান্তির কারণে সন্তানকে কখনোই এই মূল্যবান অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

১০. পিতা-মাতার শাসন ও নিয়মে ঐক্যের অভাব :

যদি একই ঘরে দুই রকম নিয়ম চলে, তবে সবচেয়ে বেশী বিভ্রান্ত হয় সন্তান। মা বলেন, আজ আর মোবাইল নয়। কিছুক্ষণ পর পিতা এসে বলেন, এই নাও, খেলো। কয়েক

৭. বুখারী হা/৬২৪৩: মুসলিম হা/২৬৫৭।

৮. ইবনু মাজাহ হা/১৯৭৭।

৯. আহমাদ হা/২৭৩৯২: সিলসিলা হুহীহাহ হা/২৬১২।

দিনের মধ্যেই সন্তান বুঝে যায় মায়ের কথা না শুনলেও সমস্যা নেই, পিতাকে পেলেই হবে। আবার মা বলেন, বড় হয়ে তোমাকে ডাকার হ'তে হবে। কিছুক্ষণ পর পিতা বলেন, না, তোমাকে ইঞ্জিনিয়ার হ'তে হবে। পিতা-মাতার এমন ভিন্নমুখী প্রত্যাশা সন্তানের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তাই সন্তানের লালন-পালন, শাসন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় পিতা-মাতার মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা ও ঐক্য থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর। আর আপোষে ঝগড়া করো না। তাহ'লে তোমরা শক্তিশীল হয়ে পড়বে ও তোমাদের প্রতিপত্তি উবে যাবে। তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' (আনফাল ৮/৪৬)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْنَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ' 'একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের জন্যে প্রাসাদস্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। এ বলে তিনি তার হাতের আঙুলগুলো একটার মধ্যে আরেকটা প্রবেশ করালেন'।^{১০}

১১. সন্তানের প্রশ্নকে গুরুত্ব না দেওয়া :

শিশু জন্মগতভাবেই কৌতূহলী। তার মনে আল্লাহ, সৃষ্টি, জ্ঞানাত-জাহান্নাম, জন্ম-মৃত্যু, ধর্মীয় বিধান এবং চারপাশের নানা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন জাগে। এসব প্রশ্ন তার জ্ঞান, ঈমান ও চিন্তাশক্তির বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিন্তু অনেক অভিভাবক সন্তানের প্রশ্নকে বিরক্তিকর মনে করে এড়িয়ে যান বা ধমক দিয়ে চূপ করিয়ে দেন। অথচ জানতে চাওয়া কোন অপরাধ নয় বরং আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ' 'যদি তোমরা না জানো, তাহ'লে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর' (নাহল ১৬/৪৩)।

সুতরাং প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত সন্তানের জানার আগ্রহকে স্বাগতম জানানো এবং তাদের প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে শোনা। আর ধৈর্যের সঙ্গে তাদের বয়স ও বুঝ অনুযায়ী সহজ ভাষায় উত্তর দেওয়া। কোন প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে তা স্বীকার করা এবং নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে জেনে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া।

১২. সন্তানের আবেগ ও অনুভূতিকে গুরুত্ব না দেওয়া :

শিশুর কান্না সব সময় দুর্বলতার লক্ষণ নয়; অনেক সময় সেটিই তার সাহায্যের নীরব আবেদন। ভয়, দুঃখ, অপমান, অভিমান কিংবা ব্যর্থতার মুহূর্তে সে যখন মনের কথা প্রকাশ করতে চায়, তখন তাকে অবহেলা করা উচিত নয়। বারবার তার অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করা হ'লে সে ধীরে ধীরে নিজের কষ্ট গোপন করতে শেখে। বাইরে সে হাসলেও ভেতরে জমতে থাকে একাকীত্ব ও অসহায়ত্ব।

সন্তানের সঙ্গে কোমল ও মমতাপূর্ণ আচরণ করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বস্ত্রত আল্লাহর অনুগ্রহের কারণেই তুমি তাদের প্রতি কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি রুঢ়ভাষী ও কঠিন হৃদয়ের হ'তে, তাহ'লে তারা

তোমার পাশ থেকে সরে যেত' (আলে ইমরান ৩/১৫৯)। রাসূল (ছাঃ) নিজে শিশুদের প্রতি ভালবাসা ও স্নেহ প্রকাশ করতেন। একবার তিনি তাঁর নাতি হাসান (রাঃ)-কে চুমু দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, 'আমার দশটি সন্তান আছে, আমি তাদের কাউকে কখনো চুমু দেইনি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ' 'যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না'।^{১১}

তাই সন্তানের কান্নাকে থামিয়ে দেওয়ার আগে তার কারণ বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তার ভয়কে উপহাস না করে আশ্বস্ত করতে হবে, দুঃখকে তুচ্ছ না করে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং ভুল করলে অপমান না করে সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে। সন্তানের হৃদয়ে পৌছানোর সবচেয়ে সহজ পথ হ'ল তার অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়া। তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং স্নেহ-মমতার সঙ্গে তার পাশে থাকা।

১৩. সন্তানকে বিশ্বাস না করে সবসময় সন্দেহ করা :

সন্তানের প্রতিটি ভুলকে অপরাধ এবং প্রতিটি দেরিকে সন্দেহের চোখে দেখলে একসময় সে সত্য কথা বলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তখন সে নিজের কথা খোলাখুলি বলার পরিবর্তে তা গোপন করতেই স্বস্তি বোধ করে। কারণ তার মনে ভয় জন্ম নেয় সত্য বললেও হয়তো তাকে বিশ্বাস করা হবে না, বরং ভুল বোঝা হবে। অথচ পারস্পরিক বিশ্বাস এমন এক শক্তি, যা সন্তানকে সত্য বলার সাহস জোগায়। বিপরীতে, অবিশ্বাসের দেয়াল যত উঁচু হয়, সন্তানের হৃদয় তত দূরে সরে যায় এবং সত্য প্রকাশের পথ তত সংকুচিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَبَعْضُ الظَّنِّ إِثْمٌ' 'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কোন কোন ধারণা পাপ' (হুজুরাত ৪৯/১২)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ' 'তোমরা ধারণা (অমূলক সন্দেহ) থেকে বেঁচে থাক। কেননা ধারণাই সবচেয়ে মিথ্যা কথা'।^{১২} তাই সন্তানকে অকারণে সন্দেহ না করে তার প্রতি আস্থা রাখুন এবং তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। ভুল করলে তাকে শুধরে নেওয়ার সুযোগ দিন, কিন্তু প্রতিটি আচরণের পেছনে খারাপ উদ্দেশ্য খুঁজবেন না। এমন একটি নিরাপদ ও ভালবাসাপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তুলুন, যেখানে সন্তান জানবে সত্য বললে সে অপমানিত বা অযথা অভিযুক্ত হবে না। বরং তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা হবে। কারণ বিশ্বাসের পরিবেশেই সন্তান সত্যবাদী, দায়িত্বশীল ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে বেড়ে ওঠে।

[ক্রমশ:]

১১. বুখারী হা/৫৯৯৭; মুসলিম হা/২৩১৮।

১২. বুখারী হা/৬০৬৪; মুসলিম হা/২৫৬৩।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞপনের দায়ভার সম্প্রতি বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। -সম্পাদক।

আমার বয়স হয়েছে

-সারওয়ার মিহবাহ

দুনিয়ায় আগমনের পর থেকে এই চিরচেনা সবুজের আঙ্গিনায় আমার বেড়ে ওঠা। সেই ছোট্ট অবস্থায় মায়ের কোলে আদর-যত্নে লালিত হ'লাম। কৈশোর কটল দুরন্তপনা স্বভাবের সমবয়সীদের সাথে। যৌবন কেটে গেল চোখের পলকে। কখন যে জীবনজুড়ে বার্ষিক্যের আগমন ঘটল, টেরও পাইনি। যখন দুয়েকটা করে চুল পাকতে শুরু করেছিল তখন ভেবেছিলাম, সমস্যার কারণে পাকছে। পাকা চুলগুলো তুলে ফেলতাম। সেদিন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। ডাক্তার বলল, 'বয়স হয়েছে তো! এখন শরীরে রোগ লেগেই থাকবে'। ডাক্তারের কথায় বেশ আশ্চর্য হ'লাম। আমার বয়স হয়েছে মানে! পরে হিসাব করে দেখলাম, সত্যিই বয়স হয়েছে।

আজকাল রাতে ঘুম কমই হয়। অনেক রাত পর্যন্ত রিলস দেখে তারপর ঘুম আসে। মনে করতাম, এটা আমার নেশা। তবে ডাক্তারের কথা শুনে মনে হচ্ছে, এটা আমার নেশা নয়, বরং বার্ষিক্য। বার্ষিক্যের কারণেই ঘুম আসে না। তাই গতরাতে শুয়ে শুয়ে আমি জীবনের হিসাব মিলাছিলাম। কর্মজীবনে যেমন টাকার হিসাব মিলত না। কোথায় কত খরচ হ'ল বলতে পারতাম না। তেমনই আজ আমি জীবনের হিসাব মেলাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছি। সত্যিই আমার যৌবনের দিকে তাকালে মাত্র কয়েকটা রাতের কথাই মনে পড়ে। হয়ত সাত-আটটা বিকেল আর দশ-বারটা সকাল। এই কয়েকটা বেলায় বিশ বছরের যৌবন কেটে গেল! কিভাবে! আমার হিসাব মেলে না।

আমি কর্মজীবনে প্রত্যেকটা কাজ সময়মত করতাম। প্রত্যেকটা কাজ শুরুর আগেই তার ডেডলাইন নির্ধারণ করে নিতাম। তবে একটা কাজের ডেডলাইন আজও নির্ধারণ করতে পারিনি। তা হ'ল, দুনিয়ার পেছনে ছোট্টা ডেডলাইন। দুনিয়ার সকল কাজের যদি ডেডলাইন থাকে, তবে ঠিক কত বছর পর্যন্ত দুনিয়ার পেছনে ছোট্টা পরে আমি ক্ষান্ত হব? এটারও তো একটা সীমারেখা থাকা উচিত তাই না? খাহেশকে ঘোড়া বানিয়ে আমি দিন-রাত ছুটে চলছি। হায়াতের সীমানা কখন যে ছুট করে শেষ হয়ে যাবে তা কি আমার জানা আছে? এই ঘোড়ার লাগাম আসলে কখন টেনে ধরা দরকার? ঘোড়ার লাগাম টানারও তো একটা ডেডলাইন থাকা উচিত, তাই না?

জীবনে এই প্রথম কোন বিষয় নিয়ে আমার আফসোস হচ্ছে। এই প্রথম মনে হচ্ছে, আমার মাধ্যমে কোন বড় ভুল হয়ে গেছে। চোখ দুটো জ্বালা করে অশ্রু বেরিয়ে আসছে। ঠিক কতদিন পরে আমার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে, আমি জানি না। আমার নিজের ওপরে বড়ই ক্ষোভ হচ্ছে। সারাজীবনের কৃতকর্মের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছে, আমি সত্যিই অপরাধী। আমার মস্তিষ্কে যত আবর্জনা রয়েছে তা যদি দৃশ্যমান হয়ে যেত তবে দুনিয়ার বুকে সৌন্দর্য বলে হয়ত কিছুই বাকী থাকত না। এই পৃথিবীর যত অমলিন ও মনোমুগ্ধকর জিনিস আছে তার সবটাই কদর্যে ছেয়ে যেত।

আমার খুব ভালই মনে পড়ছে, আমার অপর এক মুসলমান ভাই যদি কোন ভাল কাজ করে তবে আমি মুখে তাকে বাহবা দেই ঠিকই, কিন্তু আমার অন্তর ফেটে যায় হিংসায়। অনেক সময়

অনেক সুন্দর অভিনয় করেও সেই হিংসা আমি ঢাকতে পারি না। চেহারায়, কথাবার্তায় প্রকাশ পেয়েই যায়। আমি তখন তাকে মুখের বাহবাও দিতে পারি না। আমার কষ্ট হয়। অপ্রকাশ্য যন্ত্রণা অনুভব করি। তবে আজকের এই অনুতাপ সেই যন্ত্রণার চেয়েও হাযারগুণ ভারী লাগছে আমার কাছে। মনে হচ্ছে, কেউ যেন আমার বুকের ওপর পুরো একটি পাহাড় তুলে দিয়েছে।

ভুল তো মানুষেরই হয়। এটা আমিও মুখে বলি। সুতরাং মানুষ হিসাবে আমিও ভুল থেকে মুক্ত নই। কিন্তু কেউ যদি আমার একটা ভুল ধরে বসে, তখন আমি ভেতর ভেতর রাগে ফুঁসতে থাকি। আমি বিষাক্ত সাপের মত হয়ে যাই। আমি অপেক্ষার প্রহর গুণতে থাকি। সুযোগ পাওয়া মাত্রই ছোবল দিয়ে শোধ করে নেব সেই আশায়। অনেক সময় অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে সুযোগ না পেয়েও ছোবল দেই। এতে কেবল আমার মূর্ত্যতাই প্রকাশ পায়। আমার চেহারা সবার সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আমি এটার কোন ধার ধারি না। কারণ প্রতিশোধ নেয়ার মত প্রশান্তি ভিন্ন কিছুতে পাই না।

আমি আমার এই সুন্দর সেবক-চেহারার আড়ালে ঠিক কতটা আত্মস্বার্থকে প্রাধান্য দেই তা কেউ কোন দিন জানতে পারেনি। মানুষ আমাকে আত্মত্যাগী ভেবেছে। সুনিপুনভাবে আত্মত্যাগী হওয়ার অভিনয় করে যাওয়া আমি মনে মনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছি। যা আমার চেহারায় কখনোই ফুটে ওঠেনি। মানুষ শুধু পোষাক-পরিচ্ছদ, চেহারা আর কথা বলার ধরন দেখেই আমাকে ভাল মানুষ মনে করে নিয়েছে। অল্পতেই বিশ্বাস করে নিয়েছে। আমি তাদের এমন কর্মকাণ্ডে মনে মনে হেসেছি। মনে করেছি, কত পাগল এরা! তবে আজ মনে হচ্ছে, পাগল আমিই ছিলাম। আমি তাদেরকে ধোঁকা দেইনি। বরং নিজেই নিজেকে ধোঁকা দিয়েছি। আর তারা যে আমাকে বিশ্বাস করেছে, সে বিশ্বাসের যোগ্য আমি ছিলাম না।

আমার মত ভাল মানুষেই! পূর্ণ আজ এই পৃথিবী। যাদের ভেতরটা লোভ, অহংকার, বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, তারাই এই সমাজের ভাল মানুষ। মানুষের আত্ম-চিন্তাকারে যাদের পৈশাচিক অনন্দ হয়, তারাই আজ সেবক। আমার মত মানুষের পদচারণায় এই দুনিয়াটা সত্যিকারের ভাল মানুষ বসবাসের অযোগ্য হয়ে গেছে। আচ্ছা, তারা যদি আমার এই কদর্যতা সম্পর্কে জানতে পারে তবে কি ঘটতে পারে! এটা ভাবতে গেলেই চোখ আবারো ভিজে আসে। ভেতরের পাহাড় যেন অল্প অল্প করে গলে অশ্রু হয়ে বের হয়।

হয়ত এই প্রথম আমার কারো প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা আসছে। সেটা এই বিশ্ব চরাচরের মালিক আল্লাহর প্রতি। যিনি আমার মত এক পিশাচের চেহারা সৌন্দর্যের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। আমি কোনদিন তার অনুগত হইনি। তবুও তিনি আমাকে দুনিয়ার বুকে অঢেল রিযিক, সম্মান আর নে'মতে পূর্ণ এক জীবন দান করেছেন। জীবনে হয়ত এই প্রথম খুব লজ্জা লাগছে। আমি জীবনে অনেককে সরি (Sorry) বলেছি। সেগুলো ছিল চাকুরি টিকিয়ে রাখার জন্য, সংসার ঠিক রাখার জন্য বা পদোন্নতির জন্য। আমি অন্তর থেকে কখনো তাদের কাছে লজ্জিত হইনি। তবে এবার যে লজ্জা আমাকে আক্রমণ করেছে, আমি ভয় পাচ্ছি যে, তা হয়ত আমাকে খেয়ে ফেলবে। সত্যি! বড়ই নির্বোধ আমি!

আমি এতদিন শুধু চাকচিক্যের পেছনে ছুটেছি। দামী ব্রাণ্ডের পেছনে পড়ে সময় ও অর্থ নষ্ট করেছি। তবে আজ মনে হচ্ছে, মৃত্যুর পরে যারা আমার গোসল দিবে তারা যদি আমার হাতের ঘড়িটা খুলতে গিয়ে মনে করে, বাহ কত সুন্দর ঘড়ি! তারা যদি আমার জামা খুলতে গিয়ে মনে করে, কত দামী কাপড় পরত লোকটা! আমার ওয়ালেটে ১৫টা এটিএম কার্ড দেখে যদি মনে করে, এই লোকটা তো হাযার বছর বাঁচার প্রস্তুতি নিয়েছিল। তবে আমি বিবস্ত্র অবস্থায় আমার গোসলদাতাদের কাছেই লজ্জিত হয়ে পড়ব। মৃত্যুর পরের জীবন তো আরো পরে।

আমি সপ্তাহে একদিন ছালাত আদায় করেছি। মাঝে মাঝে কিছু দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতা করেছি। এতটুকু পুণ্যকে পুঁজি করেছি আমি জান্নাতের রাজকীয় জীবন কল্পনা করেছি। তবে আজ মনে হচ্ছে, যদি আমি ওমর ইবনুল খাত্তাবের মত আখেরাত চাই, তবে আমার দুনিয়াও ওমর ইবনুল খাত্তাবের মতই হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু না, আমি রোম ও পারস্যের শাসকদের মত দুনিয়া অতিবাহিত করেছি। আর আখেরাত কল্পনা করেছি ওমর ইবনুল খাত্তাবের মত। এটা হয় না! এই সোজা হিসাবটা আমার মস্তিষ্কে এতদিন ঢোকেনি। আমি এতদিন ভুল পথেই হেঁটেছি। আফসোস!

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘড়ির কাঁটা রাত দু'টা পার করেছে, খেয়াল করতে পারিনি। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ওয়ূ করে ছালাতে দাঁড়িলাম। এটা আমার জীবনের প্রথম তাহাজ্জুদ। নিয়ত করেছি, দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে জীবনের সকল গোনাহ থেকে তওবা করব। তাহ'লে হয়ত কিছুটা প্রশান্তি মিলবে। বুক জমে থাকা পাহাড়ের ওয়ন কিছুটা হালকা হবে। তবে এমন হ'ল না। ছালাত এগুতে থাকল। আমার পাহাড়ের ওয়ন আরো বাড়তে থাকল। আমার অন্তর আরো বেশী চঞ্চল হয়ে উঠল।

মনে হ'ল, জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আজ আমি আল্লাহর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি একেবারে রিক্ত, নিঃশ্ব এক ভিখারী হয়ে। আমার সাথে কোন পুণ্য নেই, আছে কেবল চরম অক্ষমতা আর বুকভরা অনুশোচনা। আমি তো এমন এক কাঙাল, যার ভিক্ষা চাওয়ার মতো একটা ঝুলি বা সামান্য পাত্রটুকুও অবশিষ্ট নেই। দুনিয়ার মোহ আর প্রবৃত্তির তাড়না আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে কামড়ে ধরে ভেতর থেকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছে। অশ্রুধারা যেন বাঁধ মানছে না। মনে হচ্ছে, আরেকটু পরেই চোখ দিয়ে রক্ত বের হবে।

আনমনে বলতে শুরু করলাম, হে আল্লাহ! আমি কি ফিরে পাবো আমার হৃদয়ের সেই পবিত্রতা? জীবনের সমস্ত সঞ্চয় হারিয়ে আমি যে আজ রিক্ত, ক্লান্ত, দিশেহারা। পাপের কালিমায় আমার অন্তর্জগৎ আজ বড়ই নোংরা। নিজের ভেতর কোন শক্তি পাচ্ছি না। সাহসগুলো যেন ভেঙে চূরমার হয়ে গেছে। হৃদয়ে আজ হঠাৎই অসংখ্য দন্ধ দাগ দেখছি। কিন্তু সেগুলোকে ধুয়ে যে পরিষ্কার করবো, সেই উপায়ও আমার জানা নেই। চোখগুলো আজ এমনভাবে শুকিয়ে গেছে যে, অপরাধের ভারে তারা ঠিকমতো কাঁদতেও পারছেনো। হৃদয়ের এই গভীর ক্ষত আর প্রকৃত অবস্থা প্রকাশের কোন ভাষা বা শক্তি আজ আমার নেই।

আমি জানি, তোমার এই পবিত্র চৌকাঠের উপযোগী একটি নেক আমলও আমার ঝুলিতে নেই। আমার দুই হাত আজ সম্পূর্ণ খালি। কিন্তু হে দয়ামল! এ যে তোমার অসীম দয়া ও কৃপার

দরবার, যা পুরোপুরি নূরে ভরপুর। আমি আশা হারাচ্ছি না। আমি জানি, তোমার দরবারের যে সম্মান ও শিষ্টাচার বজায় রাখা দরকার, আমি হতভাগা তা থেকে বঞ্চিত। আমি এমন এক অক্ষম ভিখারী, যার ঠিকমতো চাওয়ার সামান্য আদব-কায়দাও জানা নেই। তীব্র অনুশোচনার চোটে আজ আমার যবান বারবার ভুল করে ফেলছে। আড়ষ্ট ভাষা অন্তরের আতঁনাদকে ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারছে না। হে আল্লাহ! আমার এই নির্বাক, আড়ষ্ট ভাষা আর শূন্য হাতের ফরিয়াদের ওপর তুমি দয়া করো।

মনে হচ্ছিল, এই ভাষাগুলো আমার নয়। আমি এভাবে বলতে জানি না। কেউ হয়ত আমার মাঝে থেকে আমাকে এভাবে বলিয়ে নিচ্ছে। দু'হাত আসমানের দিকে তুলে ঠিক কতটা কেঁদেছি, তা মনে নেই। ক্লান্ত হয়ে মুছল্লার ওপরেই ঘুমিয়ে গেছি। ফজরের আযান শুনে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। ছালাত আদায় করতে মসজিদে যাব কি-না, ভাবছি। মানুষ কি বলবে। নাকি আগামী জুম'আ থেকেই শুরু করব। এইসব মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। ডাক্তারের কথা মনে পড়ল। আমার তো বয়স হয়েছে। এভাবে আর কতদিন? যাই মসজিদে। মানুষ যা বলবে বলুক। আমি তো তাদের ঘরে যাচ্ছি না, তাদের কাছেও যাচ্ছি না। আমি আল্লাহর ঘরে তাকে সিজদা করতে যাচ্ছি।

ফজরের ছালাতে আমাকে দেখে নিয়মিত মুছল্লীরা একটু অবাকই হ'লেন। ছালাতের পরে নিজেদের মাঝে কানায়ুযাও করলেন। আমি সকালের সূর্যের দিকে তাকিয়ে মনে করলাম, এই হয়ত আমার পরীক্ষা শুরুর সময়। এখন থেকে আমাকে শুনতে হবে তাচ্ছিল্যভরা কথাবার্তা। সহ্য করতে হবে অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ। প্রশ্নের মুখোমুখি হ'তে হবে ধাপে ধাপে। বাসায় আসলাম। সবাই জিজ্ঞাসা করছে, আমি এই ভোরের অন্ধকারে কোথায় গিয়েছিলাম! কারো কোন বিপদ হয়েছে কি-না? আমি বললাম, হ্যাঁ। একজন বড়ই বিপদে ছিল। তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম।

অফিসে গেলাম। বরাবরের মতই বন্ধুরা সিগারেটের অফার করল। আমি বললাম, ডাক্তার কড়াভাবে নিষেধ করেছেন। কাজে মন দিলাম। আজ আমি অফিসে যেন প্রথমবারের মত যোহরের আযান শুনলাম। ছালাতের জন্য উঠলাম। একজন বলল, আরে! কই যান? আমি বললাম, ছালাতে। সে বলল, হঠাৎ আপনার আচরণ এমন লাগছে কেন? কোন মুমিন জিন ভর করেছে নাকি? আমি বললাম, না। শয়তান জিন থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমার এমন অস্বাভাবিক কথাবার্তা মুহূর্তেই অফিসে ছাড়িয়ে পড়ল। আলোচনা-সমালোচনা শুরু হ'ল।

আছরের ছালাত আদায় করে অফিস থেকে বের হ'লাম। আমার স্বজনদের কথা-বার্তা ও আচার-ব্যবহারে অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হ'লেও গতরাতে যে বুকের মাঝে পাহাড়সম চাপ অনুভব করছিলাম, তা অনেকটাই হালকা হয়ে গেল। কি মনে করে একবার আকাশের দিকে তাকলাম। দেখলাম, সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ছে। আবার সেই ডাক্তারের কথা মনে পড়ল। এবার মনে একটা প্রশান্তি অনুভব করলাম। কারণ আমার বয়স হয়েছে। কাজেই আমার পরীক্ষার সময়ও খুবই কম হবে। অল্পদিনেই হয়ত আমি হায়াতের সীমানা পেরিয়ে ওপারে চলে যাব। মুছে যাব। হারিয়ে যাব। মুক্তি পাব এই ছলনাময়ী দুনিয়া থেকে।

বিপদে মুমিনের সেরা হাতিয়ার

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

মানুষের জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যখন চারদিকের সমস্ত দরজা বন্ধ মনে হয়। শত্রুর ষড়যন্ত্র, যালেমের যুলম, মিথ্যা অপবাদ বা পাহাড়সম বিপদের সামনে মানুষ নিজেকে চরম অসহায় ভাবে। দুনিয়ার কোন শক্তি যখন আর ভরসা দেওয়ার মতো থাকে না, তখন একজন মুমিন সরাসরি আরশের মালিকের দিকে তাকিয়ে এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করে, যা তার ভেতরের সমস্ত ভয়কে মুহূর্তেই শক্তিতে পরিণত করে। এটি নিছক কোন বাক্য নয়; এটি হ'ল চরম বিপদে মহান আল্লাহর ওপর নির্গত আত্মসমর্পণের এক অমোঘ ঘোষণা। ঈমানোদ্দীপক সেই দো'আটি হ'ল-

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

উচ্চারণ : হাসবুনা ল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।

অর্থ : 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম তত্ত্বাবধায়ক! (আলে ইমরান ৩/১৭৩)।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : এই দো'আটির সাথে জড়িয়ে আছে ইসলামের ইতিহাসের দু'টি অগ্নিপরীক্ষার ঘটনা।

প্রথমত হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা। যালেম শাসক নমরুদ কর্তৃক যখন ইব্রাহীম (আঃ)-কে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তখন জিব্রীল (আঃ) এসে তাঁকে সাহায্য করতে চাইলেন। কিন্তু ইব্রাহীম (আঃ) সৃষ্টির সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে সৃষ্টির ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে বলে উঠলেন, 'হাসবুনা ল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল'। ফলাফল হ'ল আল্লাহ সাথে সাথে আগুনকে নির্দেশ দিলেন, 'হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও' (আম্বিয়া ২১/৬৯)। ফলে আগুন তাঁর জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে গেল।

দ্বিতীয়ত ওহোদ যুদ্ধ পরবর্তী কঠিন মুহূর্তে মুসলিম বাহিনী যখন চরম পরিশ্রান্ত এবং রক্তাক্ত, তখন গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, আবু সুফিয়ানের বাহিনী পুনরায় আক্রমণ করতে পারে। এই ভীতিকর সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সহ ছাছাবায়ে কেরাম ভয় পাওয়ার বদলে দ্বীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হাসবুনা ল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল'। আল্লাহ তাদের এই তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা) এতই পসন্দ করলেন যে, শত্রুদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন এবং মুসলিম বাহিনী কোন যুদ্ধ ছাড়াই পূর্ণ নিরাপত্তা ও আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে মদীনায ফিরে আসলেন (আলে-ইমরান ৩/১৭৩-১৭৪; বুখারী ১/৪৫৬৩)।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য :

একক সত্তার ওপর ভরসা : 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট' এক কথার মাধ্যমে বান্দা দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা, অর্থ, প্রভাব ও মানুষের সাহায্য থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর শক্তির ওপর নিজের পুরো অস্তিত্ব সপে দেয়। অর্থাৎ আল্লাহই আমার সকল প্রয়োজন, সমস্যা ও পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কেননা তিনিই সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক।

দায়িত্ব হস্তান্তর : 'সর্বোত্তম তত্ত্বাবধায়ক' বলার অর্থ হ'ল, নিজের জীবনের সবচেয়ে কঠিন সমস্যার ফাইলটি বান্দা নিজের দুর্বল হাত থেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর হাতে তুলে দেয়। আর আল্লাহ যার অভিভাবক হয়ে যান, তাকে হারানোর শক্তি পৃথিবীর কারো নেই।

এখানে দু'টি বিষয় একসাথে প্রকাশ পায়, (১) আল্লাহর যথেষ্টতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস (২) সকল বিষয় তাঁর হাতে সমর্পণ। এই দু'য়ের সমন্বয়ই একজন মুমিনকে প্রকৃত শান্তি ও সাহস এনে দেয়।

কখন পড়বেন?

দো'আটি জীবনের যেকোন কঠিন পরিস্থিতিতে পড়া যায়। যেমন-

- বিপদ-আপদ ও কঠিন পরিস্থিতিতে, যখন কোন সমস্যার সমাধান মানুষের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়।
- যুলুমের শিকার হ'লে, যখন প্রতিকারের কোন পথ থাকে না।
- শত্রু বা প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হ'লে, যখন সংখ্যায় বা শক্তিতে নিজেকে দুর্বল মনে হয়।
- ঋণ, দারিদ্র্য বা আর্থিক দুশ্চিন্তায়, জীবিকা নিয়ে উদ্বেগ যখন মনকে ভারাক্রান্ত করে।
- অসুস্থতা ও রোগ-ব্যধির সময়, যখন চিকিৎসা সত্ত্বেও ফলাফল অনিশ্চিত মনে হয়।
- গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে, সর্বোচ্চ চেষ্টা ও পরামর্শের পর আল্লাহর উপর ফলাফল ছেড়ে দেওয়ার সময়।
- কারো ষড়যন্ত্র বা চক্রান্তের আশঙ্কা থাকলে, যখন গোপনে কেউ ক্ষতি করার চেষ্টা করছে বলে অনুভূত হয়।

স্মর্তব্য যে, এই দো'আ আমলহীনতার অযুহাত নয়। বরং যথাসাধ্য পরিশ্রম, প্রস্তুতি ও উপায়-উপকরণ অবলম্বনের পর ফলাফল আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেওয়াই প্রকৃত তাওয়াক্কুল। অর্থাৎ কর্ম ও তাওয়াক্কুল একসাথে চলে, একটি অন্যটির বিকল্প নয়।

মানব জীবনে এর প্রভাব :

১. মানসিক প্রশান্তি ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি। যখন বান্দা উপলব্ধি করে যে তার বিষয়গুলো এক অসীম ক্ষমতাবান সত্তার হাতে ন্যস্ত, তখন অহেতুক দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও অস্থিরতা কমে আসে।

২. ভয় ও আতঙ্ক থেকে মুক্তি। শত্রু যত শক্তিশালী হোক না কেন, আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসাকারী ব্যক্তি অন্তরে দৃঢ়তা অনুভব করেন।

৩. আত্মবিশ্বাস ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি। তাওয়াক্কুল মানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা নয়; বরং যথাসাধ্য চেষ্টা করে ফলাফল আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়া। এতে মানুষ দায়িত্বশীল হয়ে কাজ করার সাহস পায়, ব্যর্থতার ভয়ে অর্থহীন হয়ে থাকে না।

৪. যুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা। যখন কেউ অন্যায়ভাবে নিপীড়িত হয় এবং প্রকাশ্যে প্রতিকার পাওয়ার কোন পথ থাকে না, তখন এই দো'আ অন্তরে ধৈর্য ও ন্যায়বিচারের প্রতি আস্থা তৈরি করে।

৫. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর হওয়া। বারবার এই দো'আ পাঠের মাধ্যমে বান্দার অন্তরে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা ও ভালোবাসা ক্রমশ দৃঢ় হয়, যা তার সামগ্রিক ঈমানী জীবনকে সমৃদ্ধ করে।

উল্লেখ্য, উক্ত দো'আর সাথে 'নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাছীর' (তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী) (আনফাল ৮/৪০; হজ্জ ২২/৭৮) বাক্যটি যুক্ত করে পাঠ করা যায়।

পরিশেষে বলব, দুনিয়ার হিসাব-নিকাশে যখন আপনি শূন্য, যখন চারপাশের মানুষ আপনাকে ভয় দেখায় বা আপনার পতন কামনা করে, তখন মানুষের দিকে না তাকিয়ে আসমানের দিকে তাকান। হৃদয় থেকে সমস্ত ভয় ঝেড়ে ফেলে পূর্ণ আস্থার সাথে দো'আটি উচ্চারণ করুন! বিশ্বাস রাখুন, যে মহান সত্তা ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য জ্বলন্ত আগুনকে ফুলের বাগানে পরিণত করেছিলেন, যিনি ওহোদের ময়দানে মুসলিম বাহিনীর মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন, তিনি আজও আপনার যেকোন বিপদে আপনার জন্য যথেষ্ট হওয়ার অপেক্ষায় আছেন। শুধু প্রয়োজন ইব্রাহীম (আঃ)-এর মতো পাহাড়সম বিশ্বাস এবং ইস্পাতকঠিন তাওয়াক্কুল নিয়ে দো'আটি পাঠ করা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!!

ন্যায়বিচারের মূর্তপ্রতীক কাযী শুরাইহ (রহঃ)

-ড. নূরুল ইসলাম

কাযী শুরাইহ বিন হারেছ আল-কিন্দী ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান ন্যায়বিচারক। তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবৈঈ ফকীহ ছিলেন। ২য় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাঁকে কুফার 'কাযী' বা বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন।^১ ৩য় খলীফা ওহুমান এবং ৪র্থ খলীফা আলী (রাঃ)-এর সময়ও তিনি কুফার বিচারক ছিলেন।^২ তিনি সর্বমোট ৬০ বছর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তন্মধ্যে কুফায় ৫৩ বছর এবং বছরাতে ৭ বছর।^৩ তাঁর মতো এত দীর্ঘ সময় কোন মুসলিম বিচারক এই গুরুদায়িত্ব পালন করেননি। তিনি একশ' বিশ বছর বয়সে ৭৮/৮০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। নিম্নে তাঁর ন্যায়বিচারের কয়েকটি শিক্ষণীয় ঘটনা উল্লেখ করা হ'ল।-

১. নিজ পুত্রের বিরুদ্ধে রায় প্রদান :

শুরাইহ (রহ.)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ তাঁর পিতাকে বলল, 'আমার ও কিছু লোকের মধ্যে একটি বিষয়ে বিরোধ রয়েছে। আপনি বিষয়টি ভেবে দেখুন! যদি অধিকার আমার পক্ষে থাকে, তাহ'লে আমি তাদের বিরুদ্ধে মামলা করব; আর যদি অধিকার আমার পক্ষে না থাকে, তাহ'লে আমি তাদের বিরুদ্ধে মামলা করব না'। শুরাইহ তাঁর পুত্রের নিকট থেকে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনে বললেন, 'যাও, তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করো। পুত্র তখন তাদের কাছে গেল এবং পরস্পরের মধ্যে বিরোধের বিষয়টি শুরাইহ-এর আদালতে উপস্থাপিত হ'ল। শুরাইহ নিজ ছেলের বিরুদ্ধেই রায় প্রদান করলেন। ছেলে বাড়িতে ফিরে এলে, শুরাইহ তাকে বললেন, 'আল্লাহর কসম! তুমি যদি আগে থেকেই আমাকে বিষয়টি না বলতে তাহ'লে আমি তোমাকে দোষারোপ করতাম না। কিন্তু তুমি আমাকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলেছ যে, তুমি আমাকে অপমানিত করে ছেড়েছ। এরপর শুরাইহ বললেন, 'হে বৎস! আল্লাহর কসম! তুমি আমার কাছে তাদের সবার সমান পৃথিবী পরিমাণ মানুষের চেয়েও বেশী প্রিয়। কিন্তু আল্লাহর বিধান তোমার চেয়েও আমার কাছে অধিক মর্যাদাপূর্ণ ও প্রিয়। আমি আশঙ্কা করেছিলাম, যদি তোমাকে আগে বলে দিই যে রায় তোমার বিরুদ্ধে যাবে, তাহ'লে তুমি তাদের সঙ্গে আপস করে ফেলতে এবং এর ফলে তাদের কোন ন্যায় অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হ'ত'।^৪

শিক্ষা : শুরাইহ-এর কাছে আত্মীয়তা ও ভালোবাসার উর্ধ্ব ছিল আল্লাহর বিধান ও ন্যায়বিচার। নিজের পুত্রের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তিনি তার বিরুদ্ধে ন্যায়সংগত রায় দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। কারণ মুমিনের কাছে সত্য ও ন্যায়ের সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্কের চেয়েও শক্তিশালী।

২. এক নারীর মিথ্যা ক্রন্দন :

বিখ্যাত তাবৈঈ শা'বী (রহ.) বলেন, 'আমি শুরাইহ (রহ.)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক নারী একজন পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে তাঁর কাছে এল। সে অঝোরে কাঁদতে

লাগল। আমি বললাম, 'হে আবু উমাইয়াহ! আমার ধারণা, এই অসহায় নারীটি নির্যাতিত'। তখন শুরাইহ আমাকে বললেন, 'হে শা'বী! ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় তাদের পিতার কাছে কাঁদতে কাঁদতেই এসেছিল'।^৫

শিক্ষা : শুধু কান্না, আবেগ বা বাহ্যিক দুর্বলতা দেখে কাউকে মায়লুম ধরে নেওয়া যায় না। কারণ কান্না সত্যতার প্রমাণ নয়; বিচারককে প্রমাণ ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৩. দুর্নীতিমুক্ত ন্যায়বিচার :

দু'জন ব্যক্তি শুরাইহের কাছে একটি বিরোধ নিয়ে উপস্থিত হ'ল। তিনি তাদের একজনের বিরুদ্ধে রায় দিলেন। তখন সে ব্যক্তি বলল, 'আমি জানি, আপনি কোন দিক থেকে প্রভাবিত হয়েছেন'। (অর্থাৎ লোকটি ঘুষ গ্রহণের দিকে ইঙ্গিত করল)। তখন শুরাইহ বললেন, 'আল্লাহ ঘুষদাতা, ঘুষগ্রহীতা এবং মিথ্যাবাদীর প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন'!^৬ অথচ তিনি দুর্নীতি থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত ছিলেন। শুরাইহ বলতেন, 'উপহার যখন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, ন্যায়বিচার তখন জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায়'।^৭

৪. নির্ভীক ন্যায়বিচারক :

(ক) শুরাইহ এমন এক ব্যক্তিকে কারাগারে বন্দী করেছিলেন, যার বিরুদ্ধে একটি বিষয়ে রায় দেওয়া হয়েছিল। তখন বিশর ইবনু মারওয়ান তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন, লোকটিকে ছেড়ে দিন। কিন্তু শুরাইহ তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন, 'কারাগার আপনার, কারারক্ষী আপনার কর্মচারী; কিন্তু আমি সত্যটি দেখতে পেয়ে তার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছি এবং তাই তাকে কারাগারে বন্দী করেছি'। এ কথা বলে তিনি তাকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানান।^৮

(খ) আশ'আছ বিন ক্বায়েস শুরাইহ-এর বিচারসভায় প্রবেশ করলেন। শুরাইহ তাঁকে দেখে বললেন, আমাদের শায়েখ ও নেতা, আপনাকে স্বাগতম! এবং তাঁকে নিজের পাশে বসালেন। তিনি সেখানে বসে থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে আশ'আছের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তখন শুরাইহ তাঁকে বললেন, উঠে প্রতিপক্ষের আসনে বসুন এবং আপনার প্রতিপক্ষের সঙ্গে কথা বলুন! আশ'আছ বললেন, আমি আমার আসন থেকেই তার সঙ্গে কথা বলব। শুরাইহ বললেন, আপনাকে অবশ্যই উঠতে হবে। অন্যথা আমি কাউকে আদেশ করব, সে আপনাকে উঠিয়ে দেবে। আশ'আছ বললেন, আপনি তো বেশ উঁচু হয়ে গেছেন! অর্থাৎ আমার সঙ্গে আপনার আচরণ তো বেশ কঠোর হয়ে গেল! শুরাইহ বললেন, আপনি কি কখনো দেখেছেন যে, এই ন্যায়বিচার আপনার কোন ক্ষতি করেছে? আশ'আছ বললেন, না। শুরাইহ বললেন, তাহ'লে দেখছি, আপনি অন্যের ওপর আল্লাহর নে'মত চিনতে পারেন, অথচ নিজের ওপর আল্লাহর নে'মত চিনতে পারেন না।^৯

শিক্ষা : ন্যায়বিচারের আসনে বসার পর বিচারকের কাছে ক্ষমতাবান ও দুর্বল সকলেই সমান। সত্য ও প্রমাণের সামনে কোন ব্যক্তিগত প্রভাবের স্থান নেই। শুরাইহ-এর এই ঘটনা ন্যায়ের প্রতি অবিচলতা, বিচারিক স্বাধীনতা এবং ক্ষমতার সামনে সত্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১. ড. আকরাম যিয়া আল-উমারী, আছরুল খিলাফাহ আর-রাশেদাহ, পৃ. ১৫৭, ১৭২।

২. এ. পৃ. ১৭৪-১৭৫।

৩. তাহযীরুল কামাল ১/২৪৩।

৪. আল-মুনতায়াম, ৬/১৮৫।

৫. ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/২৩-২৪; তারীখু দিমাশক ২৩/৪৬।

৬. আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা ৭/২৫৬।

৭. তারীখু দিমাশক ২৩/৩৭।

৮. এ ২৩/৩০।

৯. আল-ইকদুল ফারীদ ১/৮২।

ক্বারী ছাহেবের সংবিধান

—সারওয়ার মিছবাহ

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়। পড়ার টেবিলে একমনে বসে আছি। সারফারায় এসে পাশে বসল। ও পাকিস্তানী, আমার বন্ধু। পাশে বসে যেন কথা শুরু করার বিষয় খুঁজে পাচ্ছিল না। তার চোখজোড়া তাকের বইগুলোর ওপর ঘুরছিল। ‘এই ফ্রেমটাতে কি সব লেখা?’ টেবিলের কোণায় একটি কাগজ বাঁধা ফ্রেম দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল। বাংলা পড়তে পারে না। তারওপরে আবার হাতের লেখা। বললাম, ‘এটা জানা কি খুবই দরকার?’ সে বলল, ‘যরুর!’ বললাম, ‘তো কফি ভী যরুর!’ সে বলল, ‘থোড়া ইস্তেয়ার কী জিয়ে!’ মিনিট দশেকের মধ্যেই কফি হাযির। আমিও একটু রিফ্রেশমেন্ট চাচ্ছিলাম। তাই কাহিনি শোনাতে বসে গেলাম।

কফির মগে চুমুক দিয়ে শুরু করলাম। এটা একটা সংবিধান। আর এই সংবিধানের প্রণেতা হ’লেন ক্বারী লুৎফর রহমান। আমার ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক। ইতিমধ্যে সারফারায়ের চোখেমুখে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে যেন আমার কথা শুনতে তার বুকে জমে আছে আকাশ সমান আগ্রহ। সে কোন প্রশ্ন করছে না। হয়ত আমার বক্তব্যের মাঝে কোন সমস্যা করতে চাচ্ছে না। আমিও তার আগ্রহ দেখে গল্প একদম গোড়া থেকেই শুরু করলাম।

সে বহুদিন আগের কথা। আব্বুর সরকারি চাকুরির সুবাদে নতুন নতুন মাদ্রাসার বারান্দা মাড়ানোর বিষয়টা একদমই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। কোথাও শিকড় গজানোর জো নেই। প্রায় প্রতিবছরই আব্বুর বদলির কুড়াল নিয়ে হাযির হন। আশেপাশে দু’চার বাড়িতে পরিচিত না হ’তেই আসবাবপত্র নেয়ার গাড়ি বাড়িতে ভিড়ে। এটা একদিকে যেমন যন্ত্রণার, তেমনি উপভোগেরও বটে। আরবীতে একটা প্রবাদ আছে, ‘প্রত্যেক নতুনই সুস্বাদু’। আমরা সেই স্বাদ গ্রহণ করতে গিয়ে কোথাও আর স্থায়ী হ’তে পারিনি।

তখন সবেমাত্র ক্লাস ফাইভে পড়ি। এবার আব্বুর বদলি হয়ে নিজের জন্মস্থানেই এসেছিলেন। আমরা গ্রামে নিজ বাড়িতেই উঠেছিলাম। তবে এই গ্রামও আমার কাছে নতুন। কারণ ছোট থেকেই বাইরে থাকা হয়েছে। কাজেই এখানেও আমার কোন বন্ধুবান্ধব নেই। সুবোধ বালকের মত প্রথমদিন মাদ্রাসায় গেলাম। লেট মাত্র আধা ঘণ্টা। নতুন মাদ্রাসা বলে কথা। তাই একটু তাড়াতাড়িই গেছি। চারিদিকে এত নতুনের ছড়াছড়ি প্রতিবছরই হয়। কিন্তু আফসোস! আমার অভ্যাসটা আর নতুন হয় না। সেই যখন ক্লাস টুতে পড়ি তখন আমার ক্লাসে লেটের এত পাবন্দী দেখে প্রথম ক্লাসের যয়নুল স্যার পাখি পড়া করে মুখস্থ করালেন, ‘সময় হ’লে কাজ ফেলে; আসতে হবে স্কুলে’। সারাদিন এই বুলিটাই আওড়লাম। পরের দিন সকালে চরণদ্বয় আওড়াতে আওড়াতে ক্লাস শুরু হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই মাদ্রাসায় পৌছলাম। ওটাই শেষ। তারপর থেকে কোন উস্তায় এই উলুবনে তাদের একটি মুক্তাও ছড়ানি।

ছোট থেকেই আমি একটু আদুরে ধরনের। প্রতিদিনই টেনেটেনে স্কুলের ঘণ্টা পড়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকি। আম্মুও তেমন কিছু বলেন না। তবে আক্রমণ শুরু হয় আটটা বাজলে। আম্মুর সেই ত্রিশ বছরে মুখ, আর আমার এই বার বছরে কর্ণছানাগুলো। তাই কি আর পারে বল? তার ওপরে কথার যে বাঁঝ, একদম টেকাই মুশকিল। আম্মু ক্ষেপলে ঘরের ছুঁচো-ইঁদুরগুলোও ভয়ে থাকে বলে আমার মনে হয়। বিছানা থেকে উঠে নাশতা করে স্কুলের পথটুকু পাড়ি দিতে যা সময় লাগে, এতটুকুই আমার দৈনিক বিলম্ব।

আব্বুর অবশ্য এখানে নীরব দর্শকের ভূমিকাতেই থাকেন। অনেক আদরের একটাই বাঁদর ছেলে! দিনে তিনবেলা আমিষ আর বছরে তিনবার ফেল! তার ওপরে প্রতিদিন বিকেলে হাতখরচা দিতেই হবে। তবুও যদি চালচলনে একটু ভদ্র হ’তাম, হয়ত আব্বুর নামের ঐ জীবটার মধ্যে কিছুটা হ’লেও চাঞ্চল্য থাকত। কিন্তু আমার যত আধুনিক অত্যাচার আর আম্মুর ঐ তড়িৎ গতিতে বদলে যাওয়া মেজাজের জ্বালা সহিতে সহিতে তার অনুভূতি নামক ইন্দ্রিয়টার বেশ ক্ষয়ক্ষতি যে হয়েছে তা বোঝাই যায়।

আব্বুর তো আমাকে কিছু বলেনই না, উল্টো আরো আমাকে সহযোগিতা করেন বলেই মনে হয়। এই যেমন, যখন নতুন মাদ্রাসায় ভর্তি হই তখনই আব্বুর শিক্ষকদের বিনয়ের সাথে বলেন, ‘ইয়ে মানে... উস্তাদজী! বলছিলাম কি... আমার ছেলেটা... মানে ঘুম থেকে অত তাড়াতাড়ি উঠতে পারে না। যদি... আপনারা একটু... তাছাড়া বেশী কড়াকড়ি হ’লে ও আবার মাদ্রাসায় আসতেই চায় না। আমিও ওর মনের বিরুদ্ধে কিছু করি না। চাই, ছেলেটা যেভাবেই হোক দু’কলম পড়ালেখা শিখুক। আমার বড় ইচ্ছা, ও বড় আলেম হবে। আর আপনারা তো শিক্ষাগুরু। তাই বলছিলাম...’। আব্বুরা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। এজন্য তার সম্মানের দিকে লক্ষ্য করেই হোক, আর অন্য কোন কারণেই হোক আবেদন মঞ্জুর হয়ে যেত সবখানেই।

এতদিন সব ঠিকঠাকই চলছিল। তবে এত বড় মাপের ঝামেলাটা যে আমাদের গ্রামেই অবস্থান করছিল, তাই বা কে জানে। এই নতুন মাদ্রাসায় আমাদের প্রথম ক্লাস নেন ক্বারী লুৎফর রহমান ছাহেব। বয়স আনুমানিক চল্লিশ হবে। চেহারা ও পোষাকে ইসলামী শালীনতা বিদ্যমান। আব্বুর সাথে তার চেনা-জানা নাকি সেই প্রাইমারি থেকেই। আব্বুরই তার চেয়ে এক বছরের জুনিয়র। ক্বারী ছাহেব ভেতর থেকেই ধার্মিক মানুষ। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত বেশ পাবন্দীর সাথেই আদায় করেন। তবে তিনি নিয়ম-কানূনের ক্ষেত্রে নাকি বেশ কড়া। তা কোন ব্যাপার নয়। তিনিও বিগতদের কাতারে ঠেলেঠেলে জায়গা করে নিবেন, এটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এমনটা তো হ’লই না, উল্টো তিনি আমাকে যাদের কাতারে দাঁড় করিয়ে দিলেন তা আমি স্বপ্নেও ভেবে দেখার প্রয়োজন অনুভব করিনি।

প্রথম দিন আধা ঘণ্টা লেটে মাদ্রাসায় গেলাম। দেখলাম সেই কাজিকত ব্যক্তিই ক্লাস করাচ্ছেন। ঢুকে যাব, ভাবলাম ব্যবহারে বংশের পরিচয় বলে কথা। একটু ভদ্রতা না

দেখলেই কেমন হয়। বাইরে দাঁড়িয়েই বললাম, উদ্ভাদজী! আসতে পারি? কিন্তু আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে তিনি পড়াতেই থাকলেন! আমার কথায় কোন ক্ষেপণই করলেন না! আবার বললাম, বেচারা তো সেকলে মানুষ, হ'তে পারে এমন ভদ্রতা তার সামনে কখনো দেখানোই হয়নি। আবার বাইরে থেকে লক্ষ্য করছি, সবাই আমার দিকে কত আগ্রহ ভরে তাকাচ্ছে! আমার স্থানে যদি এখানে একটা হীরে রেখে দেওয়া হ'ত তবুও এত আগ্রহ নিয়ে তাকাতো না। ইতিমধ্যেই দু'য়েকজন আমাকে দেখিয়ে কানাকানি করছে। আমি মনে মনে বলছি, ভেবো না, আমিও বড়লোক বাপেরই ছেলে। শিং ভেঙ্গে এসে বাছুরের পালে মিশেছি। ক'দিন পরে সবাই টের পাবে। এসব ভেবেই বুক টান করে ক্লাসে ঢুকে গেলাম। সাথে সাথেই ক্বারী হুয়ুরের কণ্ঠে একটি বাক্য ধ্বনিত হ'ল, 'রায়হান! বাইরে যাও!' তার সাথে ক্লাস জুড়ে চাপা হাসির শব্দ। আমি ঘটনা বুঝে উঠতেই রক্তে যেন হারিকেন জেগে উঠল। আমি ক্বারী ছাছেবের দিকে তাকালাম। রাগে আর লজ্জায় আমার ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছিল। তিনি আবার বললেন, 'ক্লাস থেকে বের হও। অফিস রুমে গিয়ে বস। আমি আসছি।' এবার তার কথাগুলো আগের তুলনায় বেশ কড়া মনে হ'ল। আমি আর কথা বাড়ালাম না। অফিস রুমের দিকে পা বাড়ালাম।

অফিস রুমে বসে কি সব ভাবছি। কিছুক্ষণ বাদেই তিনি এলেন। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, চা খাবে? মনে মনে বললাম, ন্যাকা, গরু মেরে জুতা দান করতে এসেছে। মুখে কিছু বললাম না। কথা তিনিই শুরু করলেন। 'দেখো রায়হান! ছাত্র জীবন ফসল চাষের সময়, আর তা ভোগ করতে পারবে কর্ম জীবনে। ফসল চাষের সময় যদি কৃষকের অবহেলা প্রকাশ পায় তবে তার সার্বিক ফলাফল কি হ'তে পারে তা অনুমান করার বয়স তোমার হয়েছে। আমি যখন ছাত্র ছিলাম সেকালের কথা বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, তাই তোমাকে কর্মজীবনের কথাই বলি। আমি পনের বছর যাবৎ এখানে শিক্ষকতা করছি। ক্লাসে অনুপস্থিতি তো দূরের কথা, কোন দিন ক্লাসে এক মিনিট দেরী হয়েছে এমন কোন নবীর নেই'।

তাকে নিজের ঢাক এত নিপুণভাবে পেটাতে দেখে আমার খুবই রাগ হ'ল। এই শিক্ষকগুলোর উপদেশ দেয়ার নামে নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়ার অভ্যাসটা আর গেল না। তখন ঠিক করে ফেললাম, মহাশয়ের কারগুয়ারীর সোয়া চৌদ্দটা আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই বাজিয়ে দেব। যেই ভাবা ব্যাস, প্ল্যান রেডি! আমি তার এই মন জুড়ানো নছীহতের ফাঁকেই মনে মনে দু'লাইন কবিতা আওড়িয়ে ফেললাম। তা চিরকুটে লেখাও হয়ে গেল। কথা শেষে যখন উঠলাম, তখন আমি তার অগোচরে চিরকুটখানা টেবিলে রেখে দিলাম। যেন আগামীকাল মাদ্রাসায় দেরী করে এসেই তিনি চিরকুটটা পান। আর আমাকেও হাড়ে হাড়ে চিনতে পারেন। পরের দিন সকাল। ক্বারী হুয়ুর মাদ্রাসার জন্য তৈরী হচ্ছেন। তার বাড়ি থেকে মাদ্রাসায় যেতে কোন গাড়ি ঘোড়ার ব্যবস্থা নেই। তিনি যে সাইকেলটাতে যাওয়া-আসা করেন তা বাড়ির

বাইরে রাখা আছে। তিনি সব গোছগাছ করে সাইকেলের দিকে পা বাড়ালেন। বাড়ি থেকে বের হয়েই স্কলব্যাগ কাঁধে একটি ছেলেকে হনহন করে হেঁটে চলে যেতে দেখলেন। তিনি পেছন থেকে নাম ধরে কয়েকবার ডাকলেন। আমি না শোনার ভান করে হাঁটতে থাকলাম। তিনি যে এত আগেই বাড়ি থেকে বের হবেন, কে জানে? তিনি তো আমাকে দেখে ফেললেন! হায়! সব প্ল্যান ভেঙে গেল। কি করি...! হস্তদন্ত হয়ে মাদ্রাসায় পৌঁছলাম। দেখলাম, অফিসে আরো শিক্ষকগণ বসে আছেন। এখন অফিসে গিয়ে তার টেবিল থেকে চিরকুটটাও সরানো সম্ভব নয়।

এদিকে ক্বারী হুয়ুর সাইকেলে চড়তে যাবেন, এমন সময় দেখলেন কোন চাকতেই পাম নেই! পাম তো নেই, টিউবের ভালভকোরও নেই! এরপরেও তিনি কিভাবে ক্লাস শুরু করবে? আগেই মাদ্রাসায় পৌঁছলেন তা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে ধরল না। হয়ত অন্য কারো সাইকেলে চড়ে এসেছেন। অফিসে ঢুকে তিনি দেখলেন তার টেবিলে একটি চিরকুট। তাতে লেখা আছে, 'শোনার কারগুয়ারী, আসেন তিনি মাদ্রাসাতে কয়েক ঘন্টা দেরী।' সাথে সাথে বিষয়গুলো তার কাছে পানির মতো স্পষ্ট হয়ে গেল।

এদিকে আমি গো-বেচারার মতো পিঠে কুলো আর কানে তুলো নিয়ে ক্লাসে বসে ভাবছি, আজকে তিনি আমাকে কি করবেন তা আল্লাহই ভালো জানেন। দুঃখে, আফসোসে, কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে নিজের শরীরকে সম্বোধন করে বলতে লাগলাম, হায় আমার আদরের শরীর! অসুস্থ দাদুকে তুমি মেডিকেলে দেখতে যাওনি! ওখানে গেলে তোমার খরাপ লাগে! আর কিছুক্ষণ পরেই তো তুমি নিকটস্থ কোন চিকিৎসালয়ে পড়ে থাকবে হে! কি দরকার ছিল ঐ লোকটার টায়ার পাংচার করার জন্য অত ভোরে ঘুম থেকে কষ্ট করে ওঠার? এর চেয়ে যদি তুমি আজ দিনমান ঘুমিয়ে থাকতে! হায় আফসোস! আজ যদি তুমি মাদ্রাসাতেই না আসতে!

ক্বারী হুয়ুর ক্লাসে ঢুকলেন। বরাবরের মতই সবার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। বললেন, 'আজ আমি ক্লাস করাব না। যরুরী কাজ আছে'। ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার আন্ধুকে এখন কোথায় পাবো? আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, বাসায়। তিনি আমাকে বাসায় যাবার সময় চিরকুটটা নিয়ে যেতে বলে বেরিয়ে গেলেন। আমি বুঝলাম না, আক্রমণ তিনি কোন দিক দিয়ে করতে চাইছেন। অফিসে গিয়ে দেখলাম চিরকুটটা আগের জায়গাতেই আছে। ও মা! এতো আমার চিরকুটটা নয়! এতে লেখা আছে, 'বাচ্চা কবুতর, অল্প দিনেই দেখবে বাচ্চা নতুন খোয়াড়ঘর'।

তার মানে হ'ল, কোলাকুলিটা দা-কুমড়ায় হয়নি। সেখানে সেখানেই হয়েছে। যেমনি বুনা ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল! এই সেকলে লোকটা এত ধুরন্ধর। এজন্যই হয়ত কথায় বলে, বইকে তার মোড়ক দিয়ে যাচাই করতে নেই। আমার কাছে বিষয়টা যেন আরো ঘোলাটে হয়ে গেল। আসলে কি ঘটছে তা বুঝতে না পারলেও অন্য রকম কিছু একটা যে ঘটবে তা বোঝা যাচ্ছে। আমিও নিজেকে বড় ধরনের বকাবকা এবং আশ্রুর বেদম প্রহার সহ্য করার জন্য

মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে শুরু করলাম।

বাড়িতে গেলাম। যা দেখলাম তা আমি মোটেও আশা করিনি। আব্বু আম্মু দু'জনেই বেজায় খুশী। কিছুক্ষণ পরে আম্মুর কাছ থেকে সেই খুশীর কারণ আবিষ্কার করলাম। আম্মু বললেন, ক্বারী লুৎফর রহমান ছাহেব এসেছিলেন। তিনি নাকি আমার নামে বেশ প্রশংসা করে গেছেন। আব্বুকে বলেছেন, 'আরে শহীদ! তোমার ছেলে এতটা মেধাবী! পড়াশোনায় এত আগ্রহী! তো শুরু থেকেই কেন একে ভালো কোন মাদ্রাসায় পড়াওনি? আমি তো প্রথমবার দেখে বুঝতেই পারিনি। একদম ছেঁড়া ধুকড়িতে আতপ চাউল! আমি হলফ করে বলতে পারি, সে ভবিষ্যতে 'কিছু একটা' হবে। এত তীক্ষ্ণ মেধা! মাত্র দু'দিনেই আমার মন জয় করে নিয়েছে।

কালকে আমি বললাম, পারলে একটু তাড়াতাড়ি মাদ্রাসায় এসো। তো আজ সবার আগেই হায়ির! এ কথা শুনতেই আম্মু বলে উঠলো, 'হুঁ হুঁ সে নিজে নিজেই আজ ঘুম থেকে উঠেছে। এটা তো আমি ভাবতেও পারিনি'। আর আব্বু তো সব শুনে গদগদ হচ্ছেন। ক্বারী ছাহেব বললেন, 'শহীদ! তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে এই বছরটা আমি রায়হানকে আমার বাড়িতে রেখে গড়ে তুলতে চাই'। আর তখন অধিকাংশ মাদ্রাসাতেই জায়গীর প্রথা চালু ছিল। সুতরাং এটা কোন অবাক হওয়ার বিষয়ও ছিল না।

আব্বু চুপচাপ উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে আসলেন আমার কাঁথা-বালিশ কাপড়চোপড় সব বেঁধে নিয়ে। আব্বু নাকি নিজেই গিয়ে আমার সবকিছু তার বাড়িতে রেখে এসেছেন। আর আজ দুপুরের খাবারটাও আমি নাকি ক্বারী ছাহেবের বাড়িতেই খাচ্ছি! এ কাহিনী শোনার পর আমি যেন আশ্চর্য হওয়ার শক্তিকুণ্ডল হারিয়ে ফেললাম। এ অবস্থায় কি করতে হবে, কি বলতে হবে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তবে এতটুকু বুঝতে পারছিলাম যে, বেশ জাঁদরেল লোকের পাল্লাতেই পড়া হয়েছে। মুখে মিঠা কথা, বগলে ছুরি! একে ঠেকাবে কে?

দুপুরবেলা ক্বারী ছাহেবের বাড়িতে আসলাম। এখনো পরিস্থিতির ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারিনি। হাত-পাগুলো যন্ত্রমানবের মতই কাজ করছে। ক্বারী ছাহেব খাবার এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এবেলা আমি মেহমানদারী করছি। এরপর থেকে কিন্তু নিজেকেই বেড়ে খেতে হবে, বুঝেছ? তোমার বাপের সাথে আমার সম্পর্ক সেই ছোট থেকেই। তাই ভাবলাম বন্ধুত্বেরও তো একটা দায়িত্ব আছে বৈ কি? আমার মত বন্ধু থাকতে তার ছেলে যদি আস্ত একটা অমানুষ হয় তবে বিষয়টাই বা কেমন হ'ল। আমি অবশ্য তার কাছে তোমাকে শাসন করার অনুমতি নিয়ে নিয়েছি। দরজায় একটা কাগজ লাগানো আছে। দেখেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, 'ওটাই তোমার সংবিধান। মুখস্থ করে নিও। আমি একটু কাউন্সিলে যাচ্ছি। সন্ধ্যায় ফিরে যেন তোমাকে পড়ার টেবিলে পাই'। বলেই চলে গেলেন।

আধা খাওয়া ভাতের প্লেট রেখে আমি গিয়ে আগে কাগজটা পড়লাম। শিরোনাম ছাড়া ক্রমিক নম্বর দিয়ে লিখে গেছে। ১.

মাদ্রাসায় যাতায়াত ক্বারী ছাহেবের সাইকেলের পিছনে চড়ে করতে হবে। ২. প্রতিদিন এক বেলা আমিষ (শর্ত সাপেক্ষে)। ৩. ক্লাসের পড়া মুখস্থ না করলে প্রতি ক্লাসের জন্য সেদিনের এক বেলা আমিষ বন্ধ থাকবে। ৪. হাত খরচা আগের মতই চলবে (শর্ত সাপেক্ষে)। ৫. মাসিক পরীক্ষায় ন্যূনতম এক বিষয়েও ফেল করলে পরবর্তী পরীক্ষা পর্যন্ত হাত খরচা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। নীচে আমার আববার স্বাক্ষরও আছে দেখলাম। দুঃখে কাঁদতে লাগলাম, মাথায় হাত দেয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে রে রায়হান? খাঁচায় পুরে খোঁচা মারা লোকের সাথে লাগতে গেলি কেন রে? ঘুম আর খাওয়া তো গেলই, হাত খরচাও গেল। এবার কি হবে?

পরের দিন সকাল। পড়া মুখস্থ হয়েছে? আমি বললাম, একটু একটু। তিনি আমাকে একটি আরবী প্রশ্ন দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা মুখস্থ কর। রাস্তায় যেতে যেতে শোনারে'। তাই হ'ল। ক্লাসে গিয়ে তিনি সবার উদ্দেশ্যে সেই প্রশ্নটিই জিজ্ঞাসা করলেন। আমি আনমনেই হাত তুললাম। তিনি বললেন, 'যাক! একজন পাওয়া গেল'। আমি আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম, আমিই শুধু হাত তুলেছি। আর সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি সবার সামনে দাঁড়িয়ে কোন রকম ঢোকগেলা ছাড়াই আরবীতে চটচট করে উত্তর দিলাম। দেখলাম সবাই আমার দিকে বাহবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ক্বারী ছাহেব মুচকি হাসছেন।

তিনি আমকে বসতে বললেন না। আমি দাঁড়িয়েই থাকলাম। আমি নিজের মধ্যে নতুন এক অহংকার অনুভব করলাম। যে অহংকারের স্বাদ ইতিপূর্বে আমি কোনদিন আশ্বাদন করিনি। পূর্বের যত অহংকার সব আমার কাছে মহূর্তে তুচ্ছ হয়ে গেল। আমি এর আগেও ক্লাসে দাঁড়িয়ে থেকেছি। সেগুলো ছিল অপমানের। তবে আজ আমি দাঁড়িয়ে আছি এক বুক অহংকার নিয়ে। খেয়াল করলাম, বৃকের গহীনে এক পিপাসার্ত উন্মাদনা জেগে উঠেছে। সে চিৎকার করে বলছে, এই স্বাদটাই আমার প্রতিদিন চাই।

সাইকেলের পিছনে চড়ে বাসায় আসছি। ক্লাসে পড়া পারার মধ্যেও যে এমন একটা স্বাদ আছে তা আমি কোনদিনই অনুভব করিনি। সারাদিন সেই সুখের মুহূর্ত অনুভব করতেই কেটে গেল। সন্ধ্যায় বই খাটা নিয়ে বসলাম। ক্বারী ছাহেব আমার পাশে এসে বসলেন। এবার তিনি আমাকে বোঝালেন না। আমাকে প্রেরণা দিলেন। আমি যেন তার কথার মাঝে এক নতুন 'আমি'-কে দেখতে পাচ্ছিলাম। আগের দিন তার নছীহত শুনে আমার রাগ হয়েছিল, তবে আজ তার কথাগুলো ভাল লাগতে শুরু করল। আমার মনে হ'ল, এমন কথা আমি এর আগে কোনদিন শুনিনি। কথা এত সুন্দর হয়!

তিনি চলে গেলেন। আমি পড়াশোনা শুরু করলাম। একটু মনোযোগ দিতেই দেখলাম পড়াগুলো পটাপট মুখস্থ হয়ে যেতে লাগল। দেখলাম, পড়া মুখস্থ হওয়ার পরেও এক ধরনের ভালোলাগা কাজ করছে! আমি আশ্চর্যই হ'লাম। এসব কি ঘটছে আমার সাথে? পরেরদিন ক্লাসে আবাবো একই কাহিনি। আবাব আগের দিনের মতই অহংকারের স্বাদ

পেলাম। সেদিন আমি সবগুলো ক্লাস মনোযোগ দিয়ে করেছি। দেখলাম, ক্লাসে মনোযোগ দিলে সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসে। এটাও তো একটা ভালোলাগার বিষয়! আমার কাছে এতদিন আটটি ঘণ্টা আট বছরের মত মনে হ'ত। আজ দেখলাম আটটি ঘণ্টা আট মিনিটেই ফুরিয়ে গেল!

এভাবে ধীরে ধীরে ক্লাসে পড়া পারা আমার নিয়মিত হয়ে উঠল। সবার কাছে স্নেহের পাত্র হয়ে উঠলাম আমি। পরপর তিন পরীক্ষায় ফাস্ট হ'লাম। বছরের শেষে আব্বু সেই বদলির কুড়াল নিয়ে হাযির হ'লেন। আমার বিদায়ক্ষেণে শিক্ষকগণ মনক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। তারা মনে করেছিলেন, একজন মেধাবী ছাত্র তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই মেধাবী ছাত্রের জন্যই যে হয়েছিল তাদের প্রতিষ্ঠানে, এটা কেবল ক্বারী লুৎফর রহমান ছাহেব জানতেন। আর জানত আমার পরিবার।

নতুন প্রতিষ্ঠানে পাড়ি জমালাম। তবে আব্বুকে আর শিক্ষকদের কাছে গিয়ে আমতা আমতা করতে হয়নি। কারণ ততদিনে তার ছেলে পেয়েছিল নতুন আনন্দের খোঁজ। যাকে কখনো পড়তে বসতে বলা লাগেনি। ক্লাসে মনোযোগী হ'তেও বলতে হয়নি। পড়াশোনাই ছিল যার কাছে নেশার মত। এভাবেই বছর গড়িয়ে যেতে লাগল। গতবছর আমার স্কলারশীপে মদীনা তুল মুনাওয়ারার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ হয়েছে। যখন দেশ ছেড়ে আসি, তখন আমাকে বিমানবন্দরে রাখতে এসেছিলেন আব্বু-আম্মু। এসেছিলেন ক্বারী লুৎফর রহমান ছাহেব। আমার জীবন বদলানোর কারিগর।

ক্বারী হুযর একদম বুড়িয়ে গেছেন। বিদায়ের সময় তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে বললেন, 'যাও, অনেক বড় হয়ে ফিরে এসো। দ্বীনের যোগ্য খাদেম হয়ে এসো। আমি তোমার পথপানে চেয়ে থাকবো। আজকের খুশী তো এই ছোট বৃকে জায়গা দিতে পারছি না রে বাবা! আমি একজন নিম্নপদের শিক্ষক। আমার ছাত্র নবীর দেশে পড়তে যাচ্ছে। এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হ'তে পারে!' আব্বাকে বললেন, 'কি শহীদ! আমি বলেছিলাম না, তোমার ছেলে বেশ মেধাবী ও অগ্রহী? বড় হয়ে সে কিছু একটা হবে? দেখলাম, আব্বু আম্মু দু'জনের চোখেই পানি। পানিতে ভেসে যাচ্ছে চার জোড়া চোখ। তবে আমি জানি, সে পানি শোকের নয়। বড় আনন্দের। বড় গর্বের।

আমার জীবনে অনেক নামী-দামী শিক্ষকের কাছে পড়ার সুযোগ হয়েছে। অনেকের কাছে অনেক কিছু শিখেছি। সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তবে আমি খুব বিনয়ের সাথেই বলব যে, ক্বারী লুৎফর রহমান ওস্তাদজী আমাকে মাত্র দু'দিনে যা শিখিয়েছেন, তা আমার সারা জীবনে কোন শিক্ষকের কাছে শেখা হয়নি। তার হাতে লেখা সেই সংবিধান আমি আজও ফ্রেমে বাঁধাই করে রেখেছি। অন্তরে ধারণ করেছি। যখনই আমি সেটার দিকে তাকিয়েছি। ওস্তাদজীর জন্য আমার দো'আ এসেছে। জানি না, দেশে গিয়ে তার সাথে আবার দেখা হবে কি-না। তবে আমি তার মতই একজন আদর্শ ও বিনয়ী শিক্ষক হব। আমি আমার ছাত্রদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর গুণিয়ে যাব অপ্রসিদ্ধ এক গ্রামের ইবতেদায়ী মাদ্রাসার একজন নিম্নপদের ক্বারী হুযরের গল্প।

বুকিং চলছে...

সন্তানকে ইসলামী ভাবধারায় গড়ে তোলার কার্যকর কৌশল হচ্ছে, ছোটবেলা থেকেই ইসলামী পরিবেশে মানুষ করা। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে ইসলামী পরিবেশে সর্ববৃহৎ চ্যালেঞ্জ। ভালো বন্ধু, ভালো প্রতিবেশী ও ইসলামী পরিবেশের জন্য রাজশাহীর নওদাপাড়া-খড়খড়ী বাইপাসের পাশে সার্ভে করলেজের পিছনে বশিরাবাদ মাদ্রাসার সন্নিবিষ্টে নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশে জমিসহ শেয়ারে ৬ তলা ভবনের ফ্ল্যাট বরাদ্দ চলছে...



প্রস্তাবিত আমানাহ প্যালেসে থাকছে-

- ১১০০ স্কয়ার ফিট স্পেস।
- ৩টি বেড রুম, ৩টি বাথরুম, ৩টি বেলকুনি, কিচেন, ডাইনিং ও ড্রয়িং।
- সিঁড়ি ও লিফট। সিসি ক্যামেরা। ফায়ার ফাইটিং-এর ব্যবস্থা।

আমাদের সুবিধামসূহ-

- জমির সমস্ত কাগজপত্র নির্ভেজাল ও আপটুডেট।
- কোলাহলমুক্ত পরিবেশ।
- দুই দিকে রাস্তা সুবিধা (১৪ ফিট ও ৬ ফিট)।

আপো পাশের প্রতিষ্ঠান সমূহ :

- বশিরাবাদ মাদ্রাসা ও মসজিদ
- সরকারি সার্ভে ইনস্টিটিউট
- ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ
- বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

এছাড়া অনতি দূরে রয়েছে বাস স্ট্যান্ড ও সরকারী-বেসরকারী অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

সরাসরি যোগাযোগ :

ভদ্রা, ২৫৪, বালিয়াপুকুর ছোট বটতলা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

©arif.rashed1436@gmail.com, ০১৭১২-৩৬২৩৬৮, ০১৮২৫-৫৬০১৪৯।

প্রজেক্ট অফিস :

আল-মাহমুদ এন্টারপ্রাইজ, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী, ০১৭৮৮-৬২৫৮৭৮।



ক্বায়ী হারুন ট্রাভেলস

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকাতুহ

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭৪২২

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছ ভাই ও বোনেরা! ক্বায়ী হারুন ট্রাভেলস (সাবেক ক্বায়ী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিতঞ্চ নিয়তে ও সুল্লাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বেশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীহ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহর সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী খাদ্য রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে গুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বজনিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহর যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বি: দ্র:

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহর প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)।
- সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বায়ী হারুন ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ৬৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, সুটি নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।

মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravelers1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বায়ী হারুণ রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

স্বদেশ

অধিকাংশ সরকারী কর্মকর্তা চোর, ভারত আমাদের করদ রাজ্য বানাতে চায়

—স্পিকার হাফিজ উদ্দীন

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ভোলায় তজুমদ্দিন উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দীন আহমদ বলেন, আমাদের এ দেশ... অদ্ভুত দেশ! অধিকাংশ সরকারী কর্মকর্তা চোর। এগুলো নানা ধরনের ঘুষখোরী, লুটপাট এসব করে। ফলে মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে। বিগত সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা জনগণের টাকা লুট করে বিদেশে শত শত বাড়ী করেছেন। সাবেক ভূমি প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী; লন্ডনেই তাঁর ৩৬০টা বাড়ী পাওয়া গেছে। দুবাইয়ে বাড়ী আছে, আমেরিকায় বাড়ী আছে। সব বাংলাদেশের সম্পদ, আপনার-আমার টাকা, জনগণের টাকা লুণ্ঠন করে তারা এভাবে নিয়ে গেছে।

ভারতের প্রতি ইঙ্গিত করে স্পিকার বলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি চায় না বাংলাদেশ ভালো থাকুক। বরং তারা আমাদেরকে একটি করদ রাজ্য বানানোর চেষ্টা করছে। বিগত ১৬-১৭ বছরে পূর্ববর্তী সরকার দেশের স্বার্থ না দেখে বিনা শুদ্ধে ট্রানজিট সুবিধা, চট্টগ্রাম বন্দরে ভারতীয় জাহাজকে অগ্রাধিকার প্রদান ইত্যাদি অসম চুক্তির মাধ্যমে প্রতিবেশীর স্বার্থই রক্ষা করেছে। এখানে তারা বিনা শুদ্ধে কিংবা নামমাত্র শুদ্ধে তাদের পণ্য পরিবহন করছে। এর ফলে আমাদের ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ সারা বিশ্বব্যাপী শুদ্ধ দিয়ে মালামাল নিতে হয়। আমাদের সীমান্তে প্রতিদিন তো লোক হত্যা করছে তারা। পাকিস্তানের সঙ্গেও তাদের বর্ডার আছে। ওখানে তো কাউকে কোন দিন গুলি চালানো হয় না।

এছাড়াও গত ১৫ই সেপ্টেম্বর লক্ষ্মীপুরে সরকারী কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী আব্দুল আউয়াল মিল্টু বলেছেন, আমাদের রাজনীতিবিদদের কাজ হ'ল বক্তৃতা দেওয়া। আর সরকারী চাকুরীজীবীদের কাজ হ'ল কিছু চুরি করা, কিছু কাজ করা।

[জনগণের নির্বাচিত মন্ত্রীদের যদি কাজ হয় কেবল বক্তৃতা দেওয়া ও সরকারী কর্মতাদের সমালোচনা করা, তাহ'লে এদের সামলাবে কে? মন্ত্রীরা যদি অপারগ হন, তাহ'লে তাদের উচিত পদত্যাগ করা। জনগণের পয়সায় মন্ত্রীত্ব করে জনস্বার্থে কাজ করতে না পারা তাদের জন্য লজ্জার বিষয় নয় কি? (স.স.)]

দেশে বছরে গড়ে ১৫ হাজার আত্মহত্যা হচ্ছে, শীর্ষে যশোর

বাংলাদেশ পুলিশ সদর দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে দেশে ৭৬ হাজার ৩৬১ জন আত্মহত্যা করেছে। অর্থাৎ প্রতি বছর গড়ে অন্তত ১৫ হাজারের বেশী মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন যা দৈনিক প্রায় ৪০ জন। এটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমিত হিসাবের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশী। গত ২০শে আগস্ট আইসিডিডিআরবি, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'লাইভ লাইফ : সুইসাইড প্রিভেনশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সভায় এসব তথ্য জানানো হয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২৩ ও ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২২ সালে সর্বোচ্চ ১৬ হাজার ৮৮৬টি আত্মহত্যার ঘটনা নথিভুক্ত হয়। যেলাভিত্তিক পরিসংখ্যানে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশী যশোরে। এর পরেই রয়েছে ঢাকা, কুমিল্লা, দিনাজপুর ও বগুড়া। পারিবারিক কলহ, বিষণ্ণতা,

সামাজিক ও মানসিক চাপ এবং পরীক্ষার ফলের কারণে মূলত তরুণ ও উঠতি বয়সীদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশী দেখা যাচ্ছে।

[আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা আত্মঘাতী হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল' (নিসা ৪/২৯)। তিনি বলেন, 'আর তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না' (বাক্বারাহ ২/১৯৫)। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এরা জাহান্নামী' বুখারী হা/৩০৬২, ৪২০৩-০৪ বিস্তারিত দ্র. 'জিহাদ ও কিতাব' বই (স.স.)]

দেশে প্রথমবারের মত কনুইসহ সম্পূর্ণ বাছ সফলভাবে প্রতিস্থাপন

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সফলভাবে সম্পূর্ণ বাছ হাড় বা 'টোটাল হিউমেরাস' (কনুইয়ের জয়েন্টসহ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। গত ৯ই সেপ্টেম্বর রাজধানীর আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হাসপাতালে অধ্যাপক ডা. মো. সিরাজুল সালেহীনের নেতৃত্বে এবং অধ্যাপক ডা. শাহ মুহাম্মাদ আমান উল্লাহের তত্ত্বাবধানে চার ঘণ্টার জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এ সাফল্য অর্জিত হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে ক্যাসারের আক্রান্ত অঙ্গ কেটে ফেলার পরিবর্তে অঙ্গটি সংরক্ষণ করে চিকিৎসা করার পদ্ধতিকে 'লিম্ব স্যালভেজ' বা অঙ্গ বাঁচানোর চিকিৎসা বলা হয়। এ ধরনের অস্ত্রোপচারে ক্যাসার আক্রান্ত অংশ সম্পূর্ণ অপসারণের পাশাপাশি আশপাশের সুস্থ টিস্যু ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাসম্ভব সংরক্ষণ করা হয়। চিকিৎসকদের মতে এ পদ্ধতিতে আক্রান্ত অঙ্গ না কেটেই ক্যাসারের চিকিৎসা সম্ভব, যা দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানে 'লিম্ব স্যালভেজ'-এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এর আগে ২০১৯ সালে একই চিকিৎসক দলের নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো 'টোটাল ফিমার' প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। বিদেশে এ ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হ'লেও দেশে তুলনামূলক সাশ্রয়ী মূল্যে 'মেড টু অর্ডার' ইমপ্লান্টের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় ইমপ্লান্টের ওপর কর প্রত্যাহার করা হ'লে দেশের অসচ্ছল রোগীরাও এ আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ আরও সহজে পাবে বলে চিকিৎসকরা আশা প্রকাশ করেছেন।

অনলাইন জুয়ার ঝুঁকিতে ২ কোটি মানুষ

বাংলাদেশে অনলাইন জুয়ার বিস্তার বর্তমানে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে প্রায় ৭৫ লাখের বেশী মানুষ অনলাইন জুয়ার যুক্ত এবং ২০২৭ সালের মধ্যে এ সংখ্যা ২ কোটি ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রতি বছর ৪.৭ থেকে ৬.১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাওয়া এই জুয়ার বাজারটিতে মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস) ও ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বছরে হাজার কোটি টাকা লেনদেন হচ্ছে। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের তথ্যমতে, গত অর্থবছরে জুয়া সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবগুলোতে প্রায় ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে। উদ্বেগজনক বিষয় হ'ল এতে চাকরিজীবী, গৃহিণী, কৃষক ও শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশী জড়িয়ে পড়ছেন। জুয়াড়িরা এমএফএসে আসা অর্থ স্থানীয় এজেন্টদের সাহায্যে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করে বিদেশে পাচার করছে। সম্প্রতি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে পুলিশের অভিযানে চীন ও পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের বহু নাগরিক বিপুল পরিমাণ ল্যাপটপ, মোবাইল ও অত্যাধুনিক সিম মডিউলসহ গ্রেফতার হয়েছে। বিদেশী এই চক্রগুলো দেশীয় এজেন্টদের যোগসাজশে প্রযুক্তির সাহায্যে জুয়া, সাইবার অপরাধ ও অর্থ পাচারের বিশাল সিডিকেট পরিচালনা করছে। ভয়াবহ এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় রূপে প্রযুক্তিগত নয়রদারী বৃদ্ধি ও জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন অপরাধ বিশেষজ্ঞরা।

বিদেশ

আফগানিস্তানে নিষিদ্ধ করা হ'ল বিক্ষোভ

আফগানিস্তানে সব ধরনের বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করে নতুন আইন পাস করেছে দেশটির সরকার। এ বিষয়ে তালেবান সরকারের মুখপাত্র যাবীহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, বিক্ষোভ হ'ল গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের জন্য প্রযোজ্য; ইসলামী আইনে এর কোন স্থান নেই। গত ২রা সেপ্টেম্বর নিষেধাজ্ঞার পক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, ইসলামী ব্যবস্থায় মানুষ রাস্তায় বিক্ষোভ করার বদলে সরাসরি শাসকের কাছে গিয়ে তাদের দাবী-দাওয়া পেশ করতে পারে। এতে সাধারণ মানুষের সময় নষ্ট হবে না এবং ব্যক্তিগত সম্পদ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। ২০২১ সালে তালেবানরা পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশটিতে বিক্ষোভের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। উল্লেখ্য, গত জুনে একটি বিক্ষোভে দু'জন নিহত হওয়ার পর দেশটিতে আর বড় ধরনের কোন বিক্ষোভ দেখা যায়নি।

২৫ বছরে মার্কিন যুদ্ধে নিহত ৪৫ লাখ, বাস্তবায়িত ৩ কোটি ৮০ লাখ

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে সন্ত্রাসী হামলার ২৫ বছর পূর্তিতে প্রকাশিত ব্রাউন ইউনিভার্সিটির 'কস্ট অব ওয়ার' প্রজেক্ট ও আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে আমেরিকার 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে'র ভয়াবহ মানবিক ও আর্থিক ক্ষতির চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত আড়াই দশকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন একাধিক যুদ্ধ ও সামরিক অভিযানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিশ্ব জুড়ে ৪৫ লাখেরও বেশী মানুষের মৃত্যু হয়েছে। প্রত্যক্ষ সামরিক হামলায় প্রায় ৯ লাখ ৪০ হাজার এবং যুদ্ধজনিত মহামারি ও খাদ্যাভাবের কারণে পরোক্ষভাবে আরও ৩৬ থেকে ৩৮ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া আফগানিস্তান, ইরাক, পাকিস্তান, ইয়েমেন, সোমালিয়া, লিবিয়া ও সিরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে প্রায় ৩ কোটি ৮০ লাখের বেশী মানুষ বাস্তবায়িত হ'তে বাধ্য হয়েছেন। এর মধ্যে আফগানিস্তানে দুই দশকের যুদ্ধে অন্তত ১ লাখ ৭৬ হাজার এবং ইরাকে ৩ লাখ ১৫ হাজারের বেশী মানুষ প্রাণ হারান। বিশেষজ্ঞদের মতে, শান্তি ফেরানোর প্রতিশ্রুতিতে শুরু হওয়া এই 'অনন্ত যুদ্ধ' মানবজাতির ইতিহাসে অন্যতম বড় সংকট ও চরম মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে।

বিশ্বে পরোক্ষ ধুমপানের শিকার ২৭০ কোটি মানুষ : বছরে মৃত্যু ১৭ লাখ

সম্প্রতি চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকী 'দ্য ল্যানসেট'-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিশ্বে শিশুসহ ২৭০ কোটির বেশী মানুষ পরোক্ষ ধুমপানের শিকার হচ্ছে। এর ফলে ২০২৩ সালে আনুমানিক ১৬ লাখ ৬০ হাজার মানুষের অকাল মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া সার্বিকভাবে তামাকজনিত কারণে উক্ত বছর বিশ্বজুড়ে প্রায় ৮০ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। পরোক্ষ ধুমপানের শিকার হওয়া এই বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে ৭৬ কোটি ৭০ লাখই শূন্য থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশু। এর বিষাক্ত প্রভাবে কেবল ২০২৩ সালেই শিশুদের শ্বাসতন্ত্রে প্রায় ৫২ লাখ সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। গবেষণায় বলা হয়, জ্বলন্ত তামাক থেকে সরাসরি নির্গত ধোঁয়া কোন ছাঁকনি ছাড়াই চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ধুমপায়ী যে ধোঁয়া গ্রহণ করে, তার চেয়েও বেশী বিষাক্ত ও ক্যানসার সৃষ্টিকারী উপাদান গ্রহণ করে আশপাশের অধুমপায়ীরা। এই প্রক্রিয়ায় নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

[আমরা বলি, উল্লুখ স্থান হোক বা যেখানেই হোক সর্বত্র ধুমপান নিষিদ্ধ করা আবশ্যিক (স.স.)]

মুসলিম জাহান

বিশ্বের অন্যতম স্মার্ট স্থাপনায় পরিণত হচ্ছে মক্কার মাসজিদুল হারাম

সমন্বিত ডিজিটাল সেবা ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে মক্কার পবিত্র মসজিদে হারামকে বিশ্বের অন্যতম স্মার্ট স্থাপনায় পরিণত করার উদ্যোগ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের সেবা প্রদান এবং পরিচালনা ব্যবস্থায় গতি আনতে 'স্মার্ট মোবিলিটি প্ল্যাটফর্ম'-এর মতো আধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিন বছর আগে যেখানে যাতায়াত সেবার জন্য প্রায় দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হ'ত, সর্বশেষ হজ্জ মৌসুমে সেই সময় কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৯ মিনিটে। পাশাপাশি প্রশাসনিক কাজগুলোর অনুমোদন প্রক্রিয়াও এখন ৮ দিনের পরিবর্তে মাত্র ৮ মিনিটে সম্পন্ন হচ্ছে। এছাড়া জাতীয় দাতব্য প্ল্যাটফর্ম 'ইহসান'-এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মাসজিদুল হারামে ৩ কোটি ৮০ লাখের বেশী ইফতার বিতরণ করা হয়েছে, যার অর্থমূল্য প্রায় ৫০ কোটি রিয়াল। অন্যদিকে মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা তাত্ক্ষণিকভাবে সমাধানে 'রাফেদ' প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ১৮টি সরকারী সংস্থাকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থার আওতায় যুক্ত করা হয়েছে। সউদী কর্তৃপক্ষের মতে, এই যুগান্তকারী ডিজিটাল রূপান্তরের মূল লক্ষ্য হ'ল ২০৩০ সালের মধ্যে মাসজিদুল হারামকে বিশ্বের অন্যতম অত্যাধুনিক ও স্মার্ট স্থাপনায় পরিণত করে হাজী ও ওমরাকারীদের জন্য দ্রুত, নিরাপদ ও সমন্বিত সেবা নিশ্চিত করা।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বই পড়লে স্মৃতিশক্তি বাড়ার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যেরও সুরক্ষা হয়

মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে বই পড়ার অভ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনের খোরাক জোগাতে এবং মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে বই পড়ার অভ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত বই পড়লে স্মৃতিশক্তি বাড়ার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। তবে আধুনিক যুগে মানুষের বই পড়ার অভ্যাস আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক পাঁচটি জরিপ এবং আটটি দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা পর্যালোচনা করে এ তথ্য জানিয়েছেন।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস মস্তিষ্কের গ্রে ম্যাটার বা ধূসর পদার্থের পরিমাণ বাড়ায়। এর ফলে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ আরও শক্তিশালী হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক সঞ্চয় বাড়তে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে শৈশবে যারা বই পড়া শুরু করে, তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণের অংশগুলো বেশী পরিপক্ব হয়। বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতির প্রেক্ষাপটে এ অভ্যাস বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, বই পড়লে মানসিক চাপ কমে এবং একা থাকার অনুভূতি দূর হয়। বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নিয়মিত বই পড়া ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিশক্তি হ্রাসের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। কল্পকাহিনীর বই মানুষকে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ঘটনার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তোলে।

নেদারল্যান্ডসের ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটের গবেষক ফক হয়েটিগ জানিয়েছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করার কারণে মানুষ এখন বইপড়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্য ও মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখতে তাই পড়ার অভ্যাস ফিরিয়ে আনা একান্ত যরুরী।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২৬

হকপন্থীদের আন্দোলনই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলন।

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

২৭ ও ২৮শে আগস্ট শুক্র ও শনিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দুই দিন ব্যাপী বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২৬-এর উদ্বোধনী ভাষণে সম্মেলনের সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব উপরোক্ত কথা বলেন। সূরা আরাফের ১৮১ আয়াত উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, প্রত্যেক নবীর উম্মতের মধ্যে হকপন্থী একদল উম্মত চিরদিন ছিলেন, আজও আছেন; যদিও তারা সংখ্যায় কম হন। এই হকপন্থীদের আন্দোলনই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলন। এটি প্রচলিত অর্থে কোন মাযহাব বা মতবাদের নাম নয়; এটি একটি পথের নাম। এ পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। তাই তিনি সকলকে এই হকপন্থী আন্দোলনে শরীক হয়ে জামা'আতবদ্ধভাবে কাজ করার উদাত আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি সবাইকে দু'দিনব্যাপী কর্মী সম্মেলনে সুশৃংখলভাবে অবস্থানের আহ্বান জানিয়ে আল্লাহর নামে কর্মী সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ১ম দিন শুক্রবার সকাল ৯-টায় সম্মেলন শুরু হয়। ১ম অধিবেশনের পরিচালক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের পরিচালনায় ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সঞ্চালনায় চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয শেখ সাদীর অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। অতঃপর আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট) জাগরণী পরিবেশন করে। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন কর্মী সম্মেলনের আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

উদ্বোধনী ভাষণের পর বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক বক্তব্য শুরু হয়। প্রথমে (১) 'কর্মীদের পারস্পরিক সদাচরণের গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (মারকায), অতঃপর (২) 'রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত আত্মগঠন' বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাকিব (মারকায), (৩) 'কর্মী গঠনে তালীমী বৈঠকের গুরুত্ব (মহিলা সংস্থার গুরুত্বসহ)' বিষয়ে কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (মারকায), (৪) 'সাংগঠনিক জীবনের অন্তরায় হিংসা ও অহংকার' বিষয়ে কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), (৫) 'নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধে অমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার' বিষয়ে মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা) বক্তব্য পেশ করেন।

বাদ আছর (৬) 'কাদিয়ানী ফিতনা প্রতিরোধে আমাদের করণীয়' বিষয়ে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস-প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম (মারকায), (৭) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর প্রচার-প্রসারে পেশাজীবী ফোরামের ভূমিকা' বিষয়ে আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের সভাপতি ডা. শওকত হাসান বক্তব্য রাখেন।

তারপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' বইয়ের আলোকে প্রশ্নোত্তর আকারে সংকলিত প্রচারপত্রের উপর ঐতিহাসিক পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীগণ গুরুত্বের সাথে পাঠচক্র অংশগ্রহণ করেন এবং অনেকেই তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ মুখস্থ করেন।

বাদ মাগরিব যেলা সংগঠন সমূহের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধিতে যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের মধ্য হ'তে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ

করেন (৮) শেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ এনামুল হক, (৯) ভোলা যেলা সভাপতি কামরুল হাসান, (১০) বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা সভাপতি মাওলানা ইব্রাহীম কাওছার সালাফী, (১১) নোয়াখালী যেলার কর্মী শহীদুল ইসলাম সজীব, (১২) কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলার কর্মী আব্দুল মুক্টিত প্রমুখ।

অতঃপর (১৩) 'তরুণ সমাজে দ্বীনের দাওয়াত প্রসারে আমাদের করণীয়' বিষয়ে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, (১৪) 'মাল ও মর্যাদার লোভ সাংগঠনিক উন্নতির অন্তরায়' বিষয়ে ঢাকা-দক্ষিণ যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ এবং বাদ এশা (১৫) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি চায়, কেন চায়, কিভাবে চায়?' বিষয়ে জামালপুর-দক্ষিণ যেলার সাধারণ সম্পাদক কামারুজ্জামান বিন আব্দুল বারী বক্তব্য রাখেন।

২য় দিন শুক্রবার বাদ ফজর মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বস্থ মসজিদে 'দ্বীনের পথে আত্মত্যাগ' বিষয়ে দরস পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার প্রিন্সিপাল হাফেয মুহাম্মাদ আখতার। একই সময়ে পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে সূরা আছরে বর্ণিত ৪টি গুণ বিষয়ে দরস পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা।

দরস শেষে সামান্য বিরতির পর বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য শুরু হয়। (১) 'সাংগঠনিক অগ্রগতি অর্জনে আমানতদারিতার গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), (২) 'সাংগঠনিক ময়বুতি বৃদ্ধিতে কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা), (৩) 'আহলেহাদীছের পরিচয়' বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (মারকায), (৪) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর চার দফা কর্মসূচী' বিষয়ে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), (৫) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পাঁচটি মূলনীতি' বিষয়ে কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া) বক্তব্য রাখেন।

নাশতার বিরতির পর (৬) 'আদর্শ ও চরিত্রবান শিশু-কিশোর গঠনে সোনামণি সংগঠনের ভূমিকা' বিষয়ে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাজিম (সাতক্ষীরা), (৭) 'মানবসেবার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (আল-আওনের ভূমিকাসহ)' বিষয়ে 'আল-আওন-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুদাউদ (রাজশাহী), (৮) 'ফিরক্বায়ে নাজিয়ার বৈশিষ্ট্য সমূহ' বিষয়ে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, (৯) 'পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসনে করণীয়' বিষয়ে কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন (১০) 'সংগঠনের অগ্রগতিতে আর্থিক ময়বুতির গুরুত্ব ও পদ্ধতি (ইনফাক্ব ফী সাবীলিল্লাহ)' বিষয়ে খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম বক্তব্য পেশ করেন (১১) অতঃপর বিগত ২০২৫-২৬ বছরের বার্ষিক সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। কর্মী সম্মেলন উপলক্ষে 'কর্মীদের প্রতি আমীরে জামা'আতের আহ্বান' পাঠ করে শুনান কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অতঃপর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ২০২৬-২৮ সেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সবশেষে আমীরে জামা'আত তাদেরসহ উপস্থিত সকলের আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও উপদেষ্টা সম্মেলন : সম্মেলনের ২য় দিন শুক্রবার সকাল ৯-টা থেকে পৌনে ১১-টা পর্যন্ত মারকাযের পূর্ব

পার্শ্বস্থ মসজিদের নীচ তলায় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সভাপতিত্বে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও উপদেষ্টা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের উদ্বোধনী বক্তব্যের পর সভাপতির নির্দেশক্রমে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কেন্দ্রের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের অডিটকৃত হিসাব পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহরুল ইসলাম (কুষ্টিয়া)। সংগঠনের ২০২৫-২৬ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট ও পরিকল্পনা পাঠ করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অতঃপর সংগঠনের অগ্রগতি সম্পর্কে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-সদর যেলার উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ, ড. মুহাম্মাদ মুহসিন (সাতক্ষীরা), জয়পুরহাট যেলার সহ-সভাপতি আব্দুল মুন্সিম ও কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ প্রমুখ। সবশেষে কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে হেদায়াতী ভাষণ প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

সম্মেলনের অন্যান্য রিপোর্ট : দু'দিন ব্যাপী কর্মী সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয মুহাম্মাদ শেখ সাদী (চট্টগ্রাম), হাফেয লুৎফর রহমান, হাফেয ওবায়দুল্লাহ ও হাফেয যাকারিয়া (মারকায) এবং হাফেয আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (কুষ্টিয়া)। জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় পরিচালক রাব্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর), সদস্য মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), কেরামত আলী (পাবনা), যিল্লুর রহমান ও মুবাশশিরুল ইসলাম (রাজশাহী), আসাদুল্লাহ মিলন (নারায়ণগঞ্জ), জিহাদুল ইসলাম (রংপুর), এনামুল হক (নওগাঁ) প্রমুখ।

আল-আওন : সম্মেলনে প্রথমদিন সকাল ৯-টা থেকে পরদিন জুম'আ পর্যন্ত মারকাযী জামে মসজিদের মূল গেইটের বাইরে উত্তর পার্শ্বে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আল-আওন'-এর উদ্যোগে ব্লাড গ্রুপিং ও রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১৯ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১১ জন রক্তদাতা সদস্য বা 'ডোনর' তালিকাভুক্ত হন।

উল্লেখ্য, এবারের কর্মী সম্মেলনে ৬৬টি সাংগঠনিক যেলার ১৫৬৯ জন বাছাইকৃত কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১৫ই আগস্ট শনিবার পার্বতীপুর, দিনাজপুর : অদ্য দুপুর ১২-টায় হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড অধিভুক্ত দিনাজপুর যেলার পার্বতীপুর থানাধীন মধ্য আটরাই আল-ফুরকান আস-সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার উদ্যোগে পরিদর্শন পরবর্তী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি মুহাম্মাদ মুনযুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির উপদেষ্টা মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান, মুহাম্মাদ মোবারক হোসাইন, মুহাম্মাদ আখতারুজ্জামান ও মাদ্রাসা পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ। উল্লেখ্য যে, সভার পূর্বে কেন্দ্রীয় মেহমান অত্র মাদ্রাসার বালক ও বালিকা শাখা পরিদর্শন করেন এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন ২০২৬

২৭শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাজশাহী : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদের ২য় তলায় 'যুবসংঘ'র কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের পৃথক পৃথক মতামতের ভিত্তিতে 'যুবসংঘ'-এর ২০২৬-২০২৮ সেশনের সভাপতি হিসাবে মনোনীত হন আহমাদুল্লাহ (কুমিল্লা)। পরদিন জুম'আর পূর্বে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে 'যুবসংঘ'-এর নিম্নোক্ত নব মনোনীত পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।-

২০২৬-২০২৮ সেশনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ তালিকা

পদবী	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	যেলা
সভাপতি	আহমাদুল্লাহ	কামিল, এম.এ	কুমিল্লা
সহ-সভাপতি	আসাদুল্লাহ আল-গালিব	দাওরায়ে হাদীছ, এম.এ	রাজশাহী
সাধারণ সম্পাদক	ফায়ছাল মাহমুদ	দাওরায়ে হাদীছ, কামিল	সাতক্ষীরা
সাংগঠনিক সম্পাদক	সাজিদুর রহমান	বি.এ (অধ্যয়নরত)	দিনাজপুর
অর্থ সম্পাদক	নাজমুন নাঈম	দাওরায়ে হাদীছ, বি.এ (অনার্স)	সাতক্ষীরা
প্রচার সম্পাদক	হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মার্কুফ	এম.এ	বগুড়া
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	আব্দুল্লাহ আল-মুহাদ্দিক	কামিল, এম.এস	কুমিল্লা
ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক	মুহাম্মাদ ফেরদাউস	এম-এড; কামিল	রাজশাহী
মিডিয়া বিষয়ক সম্পাদক	কামাল হোসাইন	কামিল	রাজশাহী
তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক	আবু তাহের মিহবাহ	দাওরায়ে হাদীছ, কামিল	নওগাঁ
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	ইয়াকুব আলী	কামিল	মেহেরপুর
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	ওবায়দুর রহমান	বি.এ (অনার্স)	যশোর
দফতর সম্পাদক	হাফেয আশিকুজ্জামান	বি.এ (অনার্স) (অধ্যয়নরত)	সাতক্ষীরা

মৃত্যু সংবাদ

১. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উপদেষ্টা ও শাহজাহানপুর উপyelার সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ রামায়ান আলী (৯০) গত ১৫ই মে বুধবার সকাল ১০-টায় ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে বগুড়া জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে উন। মৃত্যুকালে তিনি ৬ পুত্র ও ৪ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও সাংগঠনিক সাথী রেখে যান। ঐদিন বিকাল ৫-টায় যেলার শাহজাহানপুর উপyelার বৃ-কুষ্টিয়া দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক প্রচার সম্পাদক হাফেয নাজীবুল ইসলাম। জানাযা শেষে তাকে

পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মশীউর রহমান বেলালসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনাগনি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

২. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সাবেক প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল বাকী (৭২) গত ২৮শে আগস্ট রোজ শুক্রবার রাত ১২-টায় হঠাৎ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তার জামাইয়ের বাড়ী রাজবাড়ী যেলার সদর থানাধীন কুমোরপাড়ায় মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন। মৃত্যুকালে তিনি ২ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও সাংগঠনিক সাথী রেখে যান। পরদিন সকাল ১০-টায় কুষ্টিয়া যেলার দৌলতপুর থানাধীন দৌলতপুর পারিবারিক গোরস্থান সংলগ্ন ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার ভাগ্নে ও 'আন্দোলন'-এর কর্মী মাওলানা শাহজাহান আলী। জানাযা শেষে তাকে উক্ত গোরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুহসিন, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মাজীদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশিকুর রহমানসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনাগনি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

৩. 'আন্দোলন' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সাবেক সভাপতি

মাওলানা মানছুরুর রহমান (৫৯) গত ১২ই সেপ্টেম্বর রোজ শনিবার ভোর ৫-টায় কিডনী জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও সাংগঠনিক সাথী রেখে যান। ঐদিন সকাল সাড়ে ১০-টায় কুষ্টিয়া যেলার দৌলতপুর থানাধীন রেখওয়ানুল উলুম আলিম মাদ্রাসা ময়দানে তার ১ম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মাজীদুল ইসলাম। অতঃপর দুপুর আড়াইটায় তার নিজগ্রাম মেহেরপুর যেলার গাখী থানাধীন হাড়াভাঙ্গা হাজীপাড়া ঈদগাহ ময়দানে তার ২য় জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে তাকে হাড়াভাঙ্গা সামাজিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুহসিন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশিকুর রহমান, মেহেরপুর যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুন্নাযমান, কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আলী মুর্তাযা চৌধুরীসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনাগনি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি- সম্পাদক]

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী

ক্রম	পদের নাম	বিষয়		যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	বেতন
১.	সহকারী শিক্ষক	আরবী	২ জন	দাওরায়ে হাদীছ/ কামিল/ এম.এ। ৮ম শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদীছ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট যেকোন বিষয় পড়াতে সক্ষম।	১৭৫০০/-
২.	সহকারী শিক্ষক	বিজ্ঞান	১ জন	এম.এস.সি (বিজ্ঞান)। উচ্চতর শ্রেণীতে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিত পাঠদানে সক্ষম।	১৭৫০০/-
৩.	জুনিয়র সহকারী শিক্ষক	সাধারণ	১ জন	বিএ/সমমান।	১৩৫০০/-
৪.	জুনিয়র সহকারী শিক্ষক	আরবী	১ জন	দাওরায়ে হাদীছ/ফাযিল।	১৩৫০০/-
৫.	এইচআর কো-অর্ডিনেটর	১ জন		(১) Management, Business Administration বা Human Resource Management বিষয়ে BBA/MBA/MBS বা সমমান (২) HR/Admin কাজে কমপক্ষে ২-৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা (৩) অফিস পরিচালনা, স্টাফ ম্যানেজমেন্ট, বাজেট, বেতন-ভাতা সহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান। (৪) MS Word, Excel-এ কাজের দক্ষতাসহ HRM সফটওয়্যার ব্যবহারের অভিজ্ঞতা।	১৫০০০- ২৫০০০/-

বি.দ্র. :

- (ক) আগ্রহী প্রার্থীগণকে আল্লাহভীর, বিশুদ্ধ আক্বীদাসম্পন্ন, পরহেযগার এবং সুন্যাতের পাবন্দ হ'তে হবে।
 (খ) যোগ্য প্রার্থীকে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ মোবাইলের মাধ্যমে জানানো হবে ইনশাআল্লাহ।
 (গ) আগ্রহী প্রার্থীগণকে গুগল ফরম (www.bit.ly/3VqC4ew) পূরণ অথবা লিখিত আবেদনপত্র সেক্রেটারী বরাবরে নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রেরণের শেষ তারিখ ৩০শে অক্টোবর ২০২৬।

যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৩০৯-১৩৪০৫১, ০১৭১৬-৩৮৯৮৪১।

লিখিত প্রশ্ন করুন- উক্ত WhatsApp নম্বরে অথবা www.at-tahreek.com/qa

86

প্রশ্ন (৪/৪) : আমি একটি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে ফ্যাশন ডিজাইনার হিসাবে কর্মরত। এখানে বিদেশী বায়ারদের চাহিদা অনুযায়ী অনেকক্ষেত্রে শালীনতাবিরোধী পোষাক ও ডিজাইন করতে হয় এবং খ্রিডি (3D) মডেলে মানবদেহের অবয়বের উপর এসব পোষাক পরিয়ে ডিজাইন পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করতে হয়। এভাবে পোষাকের ডিজাইন করা এবং ডামিতে পরিয়ে তা পরীক্ষা করাতে আমি গোনাহগার হব কি?

-আব্দুল্লাহ আল-আনাম, আশুলিয়া, ঢাকা।

উত্তর : গোনাহগার হ'তে হবে। কারণ এর মাধ্যমে দু'টি পর্যায়ে পাপ হয়। ১. অশ্লীল পোষাক তৈরি করা ২. অশ্লীল মূর্তির গায়ে পোষাক পরিয়ে পরীক্ষা করা। আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না' (মায়দাহ ৫/২)। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'আর এমন পোষাক, যা সম্পর্কে প্রবল ধারণা থাকে যে, তা কোন পাপ কাজে ব্যবহার করা হবে, এমন ব্যক্তির কাছে তা বিক্রি করা এবং তার জন্য তা সেলাই করা জায়েয নয় (শরহুল উমদাহ ৪/৩৮৬)। শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'হ্যাঁ, তার গোনাহ হবে; কারণ সে পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করছে... অশ্লীলতা ও তার উপকরণে সহযোগিতা করা তার জন্য বৈধ নয়, সেলাইয়ের মাধ্যমে নয়, ডিজাইন/কাটিংয়ের মাধ্যমেও নয়' (ফাতাওয়া নূরুল আলাদ-দারব ১৮/৪২৩)। অতএব জেনে-শুনে অশালীন ও সতর-প্রকাশকারী পোষাকের ডিজাইন করা, বিশেষত তার বাজারজাতকরণে সরাসরি সহযোগিতা করা জায়েয নয় বরং হারাম (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/১০৯)।

প্রশ্ন (৫/৫) : আমি সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক। অবসরের সময় সরকার থেকে পাওয়া টাকা জীবদ্দশায় আমার তিন ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে বন্টন করে দিতে চাই। ছোট ছেলে এখনও পড়াশোনা করছে এবং সে অন্যদের তুলনায় অসচ্ছল। তাকে অন্য সন্তানদের তুলনায় কিছু বেশী দেওয়া কি জায়েয হবে?

-মুহাম্মাদ লতীফুর রহমান, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

উত্তর : জীবদ্দশায় অবসরকালীন প্রাপ্ত টাকা সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে মূলনীতি হ'ল সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার করা (মুসলিম হা/১৬২৩)। তবে কোন সন্তানের প্রয়োজন বেশী হ'লে, প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে কিছু বেশী দেওয়া জায়েয হ'তে পারে (ইয বিন আব্দুস সালাম, কাওয়াইদুল আহকাম ফী ইছলাহিল আনাম ২/১৪০)। ফাতাওয়া লাজনা দায়েমায় বলা হয়েছে, সন্তানদের সম্পদ দেওয়ার ক্ষেত্রে শরী'আতসম্মত নিয়ম হ'ল তাদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা। তবে কোন শারঈ কারণ থাকলে কাউকে বেশী দেওয়া জায়েয (আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৪৩৫-৩৬)। যেমন কোন সন্তান প্রতিবন্ধী হওয়া, তার পরিবার বড় হওয়া, ইলম অর্জনে ব্যস্ত থাকা ইত্যাদি (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৬/১৯৩)।

প্রশ্ন (৬/৬) : আমার কিছু হিন্দু শিক্ষার্থী রয়েছে। তারা আমাকে আদাব দিয়ে সম্বোধন করে। আমি এর কোন উত্তর

না দিয়ে হ্যাঁ বলার মত মাথা নাড়ি। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি? আর এভাবে মাথা নাড়ার মাধ্যমে তাদের অভিভাবদনের প্রতি সম্মতি প্রকাশ করা যাবে কি?

-মাহমুদুল হাসান, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : 'আদাব' সাধারণত উপমহাদেশে প্রচলিত একটি সৌজন্যমূলক সম্ভাষণ। এর মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব কোন অমুসলিম শিক্ষার্থী শিক্ষককে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 'আদাব' বললে, তার জবাবে সৌজন্যসূচকভাবে মাথা নাড়ানো বা 'হ্যাঁ' বলার মতো স্বাভাবিক ইঙ্গিত করা জায়েয। এতে তার ধর্মীয় বিশ্বাস বা উপাসনাকে সমর্থন করা হয় না (ওছায়মীন, মাজমু' ফাতাওয়া ৩/৩৪)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি... তাদের সঙ্গে সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না' (মুমতাহিনাহ ৬০/৮)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আহ'লে কিতাবের কোন ব্যক্তি তোমাদের সালাম দিলে তোমরা বলবে, ওয়া আলাইকুম অর্থাৎ তোমাদের ওপরও' (রুখারী হা/৬২৫৮; মুসলিম হা/২১৬৩; মিশকাত হা/৪৬৩৭)। উল্লেখ্য যে, 'আদাব' বলে সম্মান প্রদর্শন করায় শিরক নেই। কিন্তু নমস্কার বলার মধ্যে শিরক রয়েছে (বিস্তারিত দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই)।

প্রশ্ন (৭/৭) : মসজিদের মেহরাব কি মসজিদের অংশ? ইমাম যদি মেহরাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইমামতি করেন, তাহ'লে তাঁর ছালাত হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : মেহরাব মসজিদেরই অংশ। ইমাম মেহরাবে দাঁড়িয়ে ইমামতি করলে ছালাত ছহীহ হবে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/২৫২-২৫৩)। তবে সুন্নাত হ'ল ইমাম এমনভাবে দাঁড়াবেন, যাতে তাঁর দেহের কিছু অংশ মেহরাবের বাইরে থাকে এবং মুজাদীরা তাঁকে সহজে দেখতে ও তাঁর অনুসরণ করতে পারে। শায়েখ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, ইমামের জন্য মেহরাবের ভিতরে দাঁড়ানোতে কোন সমস্যা নেই; তবে মেহরাব এমন সংকীর্ণ হ'লে যাতে ইমাম ও মুজাদীদের মধ্যে পর্দার মতো হয়ে যায় এবং তাঁকে দেখা বা অনুসরণ করা কঠিন হয়, তখন সেটি অপসন্দনীয় হবে (আশ-শারহুল মুমত' ৪/৩০২; মাজমু' ফাতাওয়া ১২/৩২৬-৩২৭)। শায়েখ বিন বাযেরও অনুরূপ মত রয়েছে (ফাতাওয়াদ দুরূস)।

প্রশ্ন (৮/৮) : আমাদের কলেজের সম্মুখের মসজিদে দুপুর ১-টায় যোহরের আযান হয় এবং ১-টা পনের মিনিটে জামা'আত হয়। আমরা দূর থেকে আসি। এজন্য ১২-টা ৪৫ মিনিটে আমরা কয়েকজন মিলে আযানের পূর্বেই জামা'আত করে ছালাত আদায় করি। এক্ষেত্রে এভাবে ছালাত করলে ছালাত আদায় হবে কি?

-ড. আযীযুল্লাহ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়ে গেলে আযান হওয়ার পূর্বেও ছালাত আদায় করা জায়েয। কারণ ছালাতের জন্য আযান শর্ত নয়; বরং নির্ধারিত ওয়াক্ত শুরু হওয়াই শর্ত। অতএব যোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পর প্রয়োজনে কয়েকজন

মিলে জামা'আত করে যোহরের ছালাত আদায় করলে ছালাত আদায় হয়ে যাবে। তবে কোন ওযর ছাড়া নিয়মিতভাবে আগে জামা'আত করে মসজিদের জামা'আত পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা, এতে মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায়ের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হ'তে হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন কোন ব্যক্তি ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত বের হবে না' (মুসলিম হা/৬৫৫; ইবনু মাজাহ হা/৭৩৩; বায়হাকী, শুআবুল ঈমান হা/২৬০৩)। শায়েখ বিন বায বলেন, নিয়মিত ইমামের অনুমতি ছাড়া প্রচলিত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কারো জন্য ইমামের আগে এগিয়ে যাওয়া বৈধ নয় (মাজমু' ফাতাওয়া ১২/১৪৩-১৪৪)। অতএব সম্ভবপর মসজিদের জামা'আতে অংশগ্রহণ করাই উত্তম।

প্রশ্ন (৯/৯) : পিতা-মাতার নিকট থেকে পাওয়া হাতখরচের টাকা থেকে দান করলে এর ছওয়াব পিতা-মাতা পাবেন কি, না কেবল সন্তান পাবে?

-যাকারিয়া, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর।

উত্তর : পিতা-মাতা সাধারণ হাতখরচ হিসাবে টাকা দিলে এবং সন্তান সেই টাকা থেকে ছাদাক্বা করলে সন্তান ছাদাক্বার ছওয়াব পাবে এবং পিতা-মাতাও ছওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ। বিশেষত তাঁরা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সন্তানকে সেই অর্থ দিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন নারী যদি স্বামীর ঘর থেকে খাদ্য দান করে এবং এতে অপচয় বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না থাকে, তাহ'লে তার জন্য তার ছওয়াব রয়েছে, তার স্বামীর জন্যও অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে এবং খাদ্য সংরক্ষণকারীর জন্যও অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে। স্বামী তার উপার্জনের কারণে এবং নারী তার ব্যয়ের কারণে ছওয়াব পাবে' (বুখারী হা/১৪৪০; মুসলিম হা/১০২৪)। তিনি আরো বলেন, 'কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর কাছে ছওয়াবের আশায় তার পরিবারের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তবে সেই ব্যয় তার জন্য ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হবে' (বুখারী হা/৫৫; নাসাঈ হা/২৫৪৫)।

প্রশ্ন (১০/১০) : আমি একটি শো-রুমে চাকরী করি। মালিক সেখানে নিয়মিত বাজনা/সহ গান বাজান। এমতাবহায়া আমার করণীয় কি?

-শিহাব হোসাইন, জয়পুরহাট।

উত্তর : দায়িত্বের মধ্যে যদি গান চালু করা, গান নির্বাচন করা, সাউন্ড সিস্টেম পরিচালনা করা বা গান প্রচারে সহযোগিতা করা থাকে, তাহ'লে সেই কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ হারাম কাজে সহযোগিতা করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি গান শুধু মালিক নিজে বাজান এবং কাজের সঙ্গে এর কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকে, তাহ'লে ব্যক্তি নিজের জীবিকার স্বার্থে চাকরী অব্যাহত রাখতে পারে। তবে গান-বাজনা এড়িয়ে চলবে এবং মালিককে নছীহত করবে (বিন বায, ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৪/৩৮৯)। সেই সাথে বিকল্প প্রতিষ্ঠানের সন্ধান করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উত্তরণের পথ করে দেন। আর তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করে না' (তালাক ৬৫/২-৩)।

প্রশ্ন (১১/১১) : মসজিদের ভিতরে চেয়ার-টেবিল দিয়ে সুন্দর ডেকোরেশন করে কোন সভা-সম্মেলন বা অনুষ্ঠান করা যাবে কি?

-নাহিদ হাসান, কুশখালী, সাতক্ষীরা সদর।

উত্তর : মসজিদের ভেতরে প্রয়োজনীয় সভা, বৈঠক, দ্বীনী আলোচনা, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও সম্মেলন করা জায়েয। নবী (ছাঃ)-এর যুগেও মসজিদ শুধু ছালাতের জন্য নয়; শিক্ষা, আলোচনা, পরামর্শ ও অন্যান্য বৈধ কল্যাণমূলক কাজের স্থান ছিল। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন এতে কোনভাবে ছালাত আদায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় (নববী, আল-মাজমু' ২/১৭৭; ওহায়মীন, ফাতাওয়া নূরুল আলাদ-দারব চ/২)।

প্রশ্ন (১২/১২) : নফস ও রুহের মধ্যে পার্থক্য কি? সূরা ফজরের শেষ চার আয়াতে নফসুল মুতমাইন্বাহ দ্বারা নফসকে বোঝানো হয়েছে, নাকি রুহকে?

-কাওহার, কুমিল্লা।

উত্তর : প্রথমত, রুহ ও নফসের মধ্যে প্রকৃত অর্থে কোন পার্থক্য নেই। যদিও পারিভাষিক অর্থে পার্থক্য আছে। যেমন প্রাণীকে 'নফস' বলা হয়। কিন্তু 'রুহ' বা আত্মা বলা হয় না। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে' (আলে ইমরান ৩/১৮৫)। এতে বুঝা যায় যে, দেহ ও আত্মার মিলিত সত্তাকে 'নফস' বলা হয়। আর শুধুমাত্র আত্মাকে 'রুহ' বলা হয়। একদা ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন, রুহ হ'ল আমার প্রতিপালকের একটি আদেশ মাত্র' (ইসরা ১৭/৮৫)। যার প্রকৃতি মানুষের জ্ঞানের বাইরে। এমনকি আশিয়ায়ে কেরামও এর প্রকৃতি জানতেন না (শাওকানী, যুবদাতুত তাফসীর, ইসরা ৮৫ আয়াতের ব্যাখ্যা)। আর নফস সেটাই, যা আল্লাহ মানব দেহে ফুঁকে দিয়েছেন। মৃত্যুর সময় যা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই যখন রুহ কবয করা হয়, তখন তার চোখ তা দেখতে থাকে' (মুসলিম হা/৯২০; মিশকাত হা/১৬১৯ 'জানায়ের' অধ্যায়)। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কি দেখনি যে, মৃত্যুর সময় মানুষের চোখ তাকিয়ে থাকে? ছাছাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, তা তো ঐ সময় যখন তার চোখ তার নফসকে দেখতে থাকে' (মুসলিম হা/৯২১)। সুতরাং রুহ দেহে প্রাণ সঞ্চরকারী সত্তা। সেই রুহ যখন দেহের সঙ্গে যুক্ত থেকে ব্যক্তির সত্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা ও কর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তখন তাকে নফস বলা হয়। তাই একই মানবিক সত্তাকে কখনো রুহ, কখনো নফস বলা হয়। তবে উভয় শব্দের পৃথক ব্যবহারও রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সূরা ফজরের النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةٌ দ্বারা নফসই উদ্দেশ্য, তবে সেই নফসের অর্থ রুহ থেকে আলাদা কোন দ্বিতীয় সত্তা নয়। বরং মুমিনের সেই রুহ, যা ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি প্রশান্ত ও সন্তুষ্ট হয়েছে। ইমাম ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) বলেন, নফসে মুতমাইন্বাহ বলতে এমন নফসকে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর সেই প্রতিশ্রুতির ওপর প্রশান্ত হয়েছে, যা তিনি ঈমানদারদের আত্মার সাথে দিয়েছেন' (তাফসীরে ত্বাবারী, অত্র আয়াতের তাফসীর ২২৪/৪২২)।

প্রশ্ন (১৩/১৩) : সন্তান থাকা সত্ত্বেও স্বামী কি তার স্ত্রীকে জীবদ্দশায় নিজের সম্পত্তি হেবা বা দান করে দিতে পারবেন?

-আবু সাঈদ, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তর : সন্তান থাকা অবস্থাতেও স্বামী তার জীবদ্দশায় নিজের মালিকানাধীন সম্পত্তির কিছু অংশ স্ত্রীকে হেবা করতে পারবেন। তবে সন্তানদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কৌশল হিসাবে করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমার উত্তরাধিকারীদের স্বচ্ছল রেখে যাওয়া উত্তম তাদের অভাবী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চাইতে, যাতে পরে তারা মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়ায়’ (রুখারী হা/২৭৪২; মিশকাত হা/৩০৭১)। তাছাড়া একাধিক স্ত্রী থাকলে এবং তাদের হেবা করতে চাইলে ন্যায়বিচার ও সমতা রক্ষা করা কর্তব্য।

প্রশ্ন (১৪/১৪) : ছাড়াবায়ে কেরাম বলতেন, মৃত্যুর ৪০ দিন আগে থেকেই রুহের দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক আলগা হ’তে শুরু করে। অথচ আমরা দিবা খাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি, গ্লান করছি... কিছুই টের পাই না। কিন্তু আল্লাহ তা’আলা এতটাই দয়ালু যে, বান্দাকে খালি হাতে নেন না। যাওয়ার আগে তিনি একটি চুপচাপ ইশারা পাঠান। এই বক্তব্য কি সঠিক?

-জাবের, টিকরামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এমন কোন শারঈ দলীল নেই যাতে প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর ৪০ দিন পূর্ব থেকেই মানুষের দেহে মৃত্যুর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তবে আল্লাহ তা’আলার সুস্পষ্ট বক্তব্য হ’ল মৃত্যুর ফেরেশতা আসার মাধ্যমে যে মৃত্যু সংঘটিত হয়, তা নির্ধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার পরই ঘটে। আল্লাহ তা’আলা বলেন, ‘আল্লাহ কখনোই কাউকে অবকাশ দিবেন না যখন তার নির্ধারিত সময়কাল এসে যাবে। বস্তুত আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম বিষয়ে খবর রাখেন’ (মুনাফিকুন ৬৩/১১)। সুতরাং সর্বদা আমলে ছালাহ করার মাধ্যমে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা স্বাদ বিনষ্টকারী বিষয় অর্থাৎ মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ কর’ (তিরমিযী হা/২৩০৭; মিশকাত হা/১৬০৭, সনদ ছহীহ)। ইবনু ওমর (রাঃ) বলতেন, ‘সন্ধ্যায় উপনীত হ’লে সকালের অপেক্ষা কর না; আর সকালে উপনীত হ’লে সন্ধ্যার অপেক্ষা কর না (রুখারী হা/৬৪১৬; মিশকাত হা/১৬০৪)।

প্রশ্ন (১৫/১৫) : প্রায় এক বছর যাবৎ আমি একটি হারাম সম্পর্কে জড়িত ছিলাম। এ সম্পর্ক থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করলে মেয়েটি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং আত্মহত্যা করতে চায়। এমতাবস্থায় এ হারাম সম্পর্ক থেকে বের হওয়ার জন্য আমার করণীয় কি? সে আত্মহত্যা করলে আমার কোন পাপ হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বগুড়া।

উত্তর : হারাম সম্পর্কের জন্য উভয়ে খালেছ নিয়তে আল্লাহর নিকটে তওবা করবে এবং অবৈধ সম্পর্ক হ’তে বিরত থাকবে। কাউকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা কবীরা গোনাহ ও গুরুতর অপরাধ। এক্ষেত্রে যদি উভয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে বিবাহের ইচ্ছা থাকে এবং বিবাহের সামর্থ্য ও উপযুক্ততা থাকে, তাহলে উভয় পরিবারের

অভিভাবকদের মাধ্যমে শারঈ পদ্ধতিতে বিবাহের ব্যবস্থা করবে। আবুবকর ছিন্দীক (রাঃ), ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী এমন পাপীদের মধ্যে বৈধ বিবাহকে উৎসাহিত করেছেন’ (মুহান্নাফ আব্দুর রায়যাক হা/১২৭৯৫, ১২৭৯০)।

প্রশ্ন (১৬/১৬) : আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চাকুরী করলে পর্দা, সন্তানদের লালন-পালন ও পারিবারিক দায়িত্বে কোন ক্ষতি হ’লে এর হকুম কি?

-জাহিদ হাসান, খিলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তর : স্ত্রীসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপরে। আল্লাহ তা’আলা নারীর ওপর পুরুষকে দায়িত্বশীল ও কর্তৃত্বশীল করেছেন দু’টি কারণে। এর একটি হ’ল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিশেষ মর্যাদা আর অপরটি হ’ল পুরুষের নিজস্ব উপার্জন। আল্লাহ তা’আলা বলেন, ‘পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা (নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য) তাদের মাল-সম্পদ হ’তে ব্যয় করে থাকে’ (নিসা ৪/৩৪)। এক্ষেত্রে স্বামীর দ্বারা পরিবারের খরচ চালানো কঠিন হয়ে পড়লে বাধ্যগত অবস্থায় স্ত্রী পর্দার বিধান মেনে নিরাপদ পরিবেশে চাকুরী করতে পারে। তবে অবশ্যই স্বামীর অধিকার সংরক্ষণ, সন্তান পালনে যথাযথ ভূমিকা রাখা এবং ইসলামী পরিবেশের গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ অর্থ উপার্জন গুরুত্বপূর্ণ হ’লেও সন্তানদের ঈমান, চরিত্র ও তারবিয়াজের ক্ষতি করে অর্জিত অতিরিক্ত অর্থ প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনবে না। এক্ষেত্রে স্বামী পরিবারের খরচ বহনে সক্ষম হওয়ার পরেও স্ত্রীকে পর্দাহীন পরিবেশে চাকুরী করতে দিলে এবং পারিবারিক হক আদায়ে ক্ষতি হ’লে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দায়ী থাকবেন।

প্রশ্ন (১৭/১৭) : আমি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একজন ডুবুরী (ডাইভার)। আমাদের ডাইভিং ভাতার সরকারী হার খুবই কম। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ও সম্মতিতে অনেক সময় প্রকৃত ডাইভিং বা প্রাকটিস ডাইভের চেয়ে বেশী সংখ্যা দেখিয়ে অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হয়। এমনকি কখনো বাস্তবে প্রাকটিস ডাইভ না করেও অনুমতি অনুযায়ী তা হিসাবভুক্ত করা হয়। এ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সম্মতি ও স্বাক্ষরও থাকে। এভাবে প্রকৃত সময় বা ডাইভের চেয়ে বেশী দেখিয়ে অতিরিক্ত ভাতা গ্রহণ করা কি জায়েয?

-তাওহীফ আহমাদ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : এই অতিরিক্ত ভাতা সরকারী বিধি অনুযায়ী অনুমোদিত হ’লে তা গ্রহণ করা জায়েয। কিন্তু বিধির বাইরে গিয়ে প্রকৃত ডাইভের সংখ্যা বা সময় বাড়িয়ে দেখিয়ে অতিরিক্ত সরকারী অর্থ গ্রহণ করা জায়েয নয়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর থাকা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তিনি আইন ও সরকারী বিধির আওতায় সেই অর্থ অনুমোদন করবেন। অন্যথায় তাঁর পূর্ণ সম্মতি বা স্বাক্ষর অবৈধ কাজকে বৈধ করবে না। কারণ এটা আমানতের খেয়ানত (ওহায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতুহ ২২/১১৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/৪০৪-৪০৬)। যদি পূর্বে এভাবে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা

হয়ে থাকে এবং পরে নিশ্চিত হওয়া যায় যে তা বিধিসম্মত ছিল না, তাহ'লে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি যাচাই করে অবৈধভাবে গৃহীত অর্থ সরকারী কোষাগারে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে (নিসা ৪/৫৮)। এতে অপারগ হলে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করবে এবং ভবিষ্যতে কখনই এরূপ করবে না। বরং অল্প হালাল রুযীতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কোন একটি বৈধ পথে রুযী ব্যবস্থা করে দিবেন (তলাক ৬৫/২-৩)।

প্রশ্ন (১৮/১৮) : আমি বড় অঙ্কের টাকা ঋণ নিতে চাই। পিতাকে যদি বলি, আমি ঋণ পরিশোধের আগেই মারা গেলে আপনি আপনার সম্পত্তি থেকে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন এবং তিনি আমার মৃত্যুর পর তা পরিশোধ করেন, তাহ'লে কি এটাকে আমার প্রতি উপহার হিসাবে গণ্য করা হবে? সেক্ষেত্রে কি তিনি অন্য ভাই-বোনদেরও সমপরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য? নাকি আমার ঋণ পরিশোধের কারণে তাদের প্রতি যত্ন করা হবে?

—মো'আয্যাম হোসাইন, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তর : প্রথমত, কারো উপর নির্ভর করে ঋণ করা যাবে না। ঋণ তখনই করবে যখন কোন উপায় থাকবে না। দ্বিতীয়ত, পিতা সন্তানের ঋণ পরিশোধে বাধ্য নন। এক্ষেপে ঋণগ্রস্ত সন্তানের হঠাৎ মৃত্যু হ'লে পিতা নিজের সম্পদ থেকে যদি তার ঋণ পরিশোধ করেন, তাহ'লে এটি হেবা হিসাবে গণ্য হবে না। বরং এটি সন্তানের ওপর পিতার পক্ষ থেকে সহযোগিতা ও ইহসান হিসাবে গণ্য হবে। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'যখন সন্তানদের একজনের এমন বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়, যা অন্যের নেই; যেমন তার ওপর আরোপিত কোন ক্ষতিপূরণের ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া, তার মোহর পরিশোধ করে দেওয়া... ইত্যাদি। অনুরূপ যদি একজনের প্রয়োজন থাকে, অন্যজনের প্রয়োজন না থাকে, তাহ'লে তার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করা যাবে (আল-ইখতিযারাত পৃ. ৫১৬)। এমনকি পিতা তার যাকাতের সম্পদ থেকেও সন্তানের ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন (ওছায়মীন, মাজমু' ফাতাওয়া ১৮/৪১৬)।

প্রশ্ন (১৯/১৯) : পর্দার ক্ষেত্রে নারীদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা অর্থাৎ নিকাব পরিধান করার শারঈ বিধান কি? নারীদের শরীরের কোন কোন অঙ্গ আওরাতের অন্তর্ভুক্ত?

—ফারীহা তাসনীম, সিলেট।

উত্তর : নারীদের সর্বাত্মক সতরের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নারী হ'ল গোপন বস্তু। যখন সে বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়' (তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯, সনদ ছহীহ)। তাই তার মুখমণ্ডলসহ সমগ্র শরীর আবৃত করা আবশ্যিক। আর মুখ ঢাকার জন্য নিকাব একটি শারঈ পদ্ধতি। আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন, 'আমরা পুরুষদের থেকে আমাদের মুখমণ্ডল আবৃত রাখতাম..' (ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২৬৯০; মুওয়াত্তা মালেক হা/১০৫০; ইরওয়া হা/১০২৩)। ফাতিমা বিনতে মুনিযির বলেন, 'আমরা আসমা

বিনতে আবুবকর (রাঃ)-এর সঙ্গে ইহরাম অবস্থায় আমাদের মুখমণ্ডল আবৃত করতাম (মুওয়াত্তা মালেক হা/১৬.১০৫০; ইরওয়া হা/১০২৩, সনদ ছহীহ)। অর্থাৎ ইহরাম আবস্থায় নিকাব নিষিদ্ধ থাকলেও পরপুরুষের সামনে মুখমণ্ডল আড়াল করা মহিলা ছাহাবী ও সালাফদের আমল দ্বারা প্রমাণিত। অতএব ইহরামের বাইরে সাধারণ অবস্থায় মুখমণ্ডল আবৃত করার গুরুত্ব আরও অধিক। শায়েখ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, ইহরাম অবস্থায়ও নারীদের পাশ দিয়ে যখন পর-পুরুষ অতিক্রম করবে, তখন নারীদের জন্য তাদের মুখমণ্ডল আবৃত করা ওয়াজিব' (মাজমু' ফাতাওয়া ২২/১৮৮)। শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন, নারীর জন্য গায়ের মাহরাম পুরুষদের থেকে নিজের মুখমণ্ডল আবৃত করা ওয়াজিব, এমনকি সে ইহরাম অবস্থায় থাকলেও (মাজমু' ফাতাওয়া ৩/৩৫৬)। উল্লেখ্য যে, নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের কজি সতরের অন্তর্ভুক্ত কি না এ বিষয়ে ফক্বীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে ফিৎনার আশঙ্কা থাকলে গায়ের মাহরাম পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল আবৃত করা ওয়াজিব—এ বিষয়ে সর্বযুগের বিদ্বানগণ একমত। অতএব পর্দার ক্ষেত্রে গায়ের মাহরাম পুরুষের সামনে নারীর মুখমণ্ডলসহ সমগ্র শরীর আবৃত রাখা কর্তব্য।

প্রশ্ন (২০/২০) : ফাইনাল পরীক্ষার কারণে রামাযানে ছিয়াম পালন না করে পরে ক্বাযা করা যাবে কি?

—ইমরান হোসাইন, যশোর।

উত্তর : রামাযানের ছিয়াম পালন ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম (রুখারী হা/৮, মুসলিম হা/১৬)। ইচ্ছাকৃতভাবে যা পরিত্যাগ করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত (ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু' ফাতাওয়া ২৫/২২৫)। এক্ষেপে যেসব কারণে ফরয ছিয়াম ক্বাযা করা যায়, পরীক্ষা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব পরীক্ষার অজুহাতে ছিয়াম ক্বাযা করা হারাম (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১০/২৪০)।

প্রশ্ন (২১/২১) : ইন্ডিগো, ব্ল্যাক মেহেদী বা অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে চুল কালো করা কি জায়েয? এক্ষেত্রে রাসায়নিক রং ও প্রাকৃতিক রঙের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? ইন্ডিগো ব্যবহারে চুল বাদামী বা কালচে-বাদামী হ'লে এর বিধান কি? এটি কালো কলপ নয়, তাই হালাল—এ যুক্তি কতটুকু সঠিক?

—ইয়ামীন, পাবনা।

উত্তর : পাকা চুল বা দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করে রং পরিবর্তন করা মুস্তাহাব। তবে শর্ত হ'ল তা যেন সরাসরি কালো রঙের না হয়। যখন আবুবকর (রাঃ)-এর পিতা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন এবং তাঁর মাথা ও দাড়ির চুল ধবধবে সাদা ছিল, তখন নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে রঙ করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, 'তবে তোমরা কালো রঙ পরিহার কর' (মুসলিম হা/২১০২; মিশকাত হা/৪৪২৪)। এক্ষেপে যদি ইন্ডিগো বা মেহেদী ব্যবহারে খাঁটি কালো না হয়ে বাদামী, লালচে-বাদামী, অথবা কালো ও লালের মাঝামাঝি রং হয়, তাহ'লে তা নিষিদ্ধ কালো রং হিসাবে গণ্য হবে না। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে দিয়ে গেলেন, তিনি মেহেদী দ্বারা খিযাব করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

এটি কতই না সুন্দর! অতঃপর আরেক ব্যক্তি গেলেন, তিনি মেহেদী ও কাতাম দ্বারা খিঁষাব করেছিলেন। তিনি বললেন, এটি এর চেয়ে সুন্দর। এরপর আরেক ব্যক্তি গেলেন, তিনি হলুদ রং দ্বারা খিঁষাব করেছিলেন। তিনি বললেন, এটি এ সবগুলোর চেয়ে সুন্দর (আবুদাউদ হা/৪২১১; মিশকাত হা/৪৪৫৪, সনদ জাইয়েদ)। আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন তাঁর ছাহাবীদের মধ্যে আবুবকর (রাঃ) ছিলেন সবচেয়ে বয়স্ক। তিনি মেহেদী ও কাতাম দ্বারা তাঁর চুল রঞ্জিত করেছিলেন, ফলে চুলের রং গাঢ় হয়ে উঠেছিল (বুখারী হা/৩৯২০; মুসলিম হা/২৩৪১)। ইমাম যুহরী বলেন, বিভিন্ন রং ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। আর তার মধ্যে সবচেয়ে গাঢ় রং আমাদের কাছে অধিক পসন্দনীয় (মুসানদে আহমাদ হা/৮০৬৯-এর আলোচনা)। অতএব উপাদান প্রাকৃতিক হৌক বা কেমিক্যাল হৌক সরাসরি কালো খেঁষাব ব্যবহার করা যাবে না।

প্রশ্ন (২২/২২) : তাহাজ্জুদের সময় ছালাত ও ওযু না করে গভীর রাতে শুধু দু'হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি?

-আসাদুয্যামান, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : ছালাত ও ওযু ছাড়াও হাত তুলে দো'আ করা যাবে। কারণ দো'আর জন্য ওযু শর্ত নয় (বিন বায, মাজমু' ফাতাওয়া ২৬/১৩৩)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'রাতে এমন একটি সময় রয়েছে, কোন মুসলিম সে সময়ে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন' (মুসলিম হা/৭৫৭; মিশকাত হা/১২২৪)।

প্রশ্ন (২৩/২৩) : যদি কোন এলাকায় ছহীহ আক্বীদাভিত্তিক কোন মসজিদ না থাকে, কিন্তু সেখানে শিরক ও বিদ'আত মিশ্রিত মসজিদ বিদ্যমান থাকে, তাহ'লে ছহীহ আক্বীদার ভিত্তিতে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য কি যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে?

-আমানুল্লাহ, ডালাস, আমেরিকা।

উত্তর : যাকাতের অর্থ দিয়ে নতুন মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। যদিও সেখানে ছহীহ আক্বীদাভিত্তিক মসজিদ না থাকে এবং শিরক-বিদ'আতমিশ্রিত মসজিদে ছালাত আদায় করতে হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা যাকাতের আটটি খাত নির্ধারণ করেছেন যার মধ্যে মসজিদ নেই (বিন বায, ফাতাওয়া নূরন্ আলাদ-দারব ১৫/৩৬০)। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, মসজিদসমূহ আয়াতে বর্ণিত আটটি খাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যাকাত ব্যয় করা উক্ত আটটি খাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ (ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ২/৯১)।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : নিজ নাতনীকে নিজ ভাগ্নের সাথে বিবাহ দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল লতীফ, রাজপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : নিজের নাতনীকে নিজের ভাগ্নে তথা বোনের ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া জায়েয। কারণ তারা পরস্পরের মাহরাম নয়। শরীআ'তে যেসব নারীর সঙ্গে বিবাহ হারাম করা হয়েছে, তাদের তালিকায় এ সম্পর্কের উল্লেখ নেই (নিসা ৪/২৩)। আর যেখানে মামাতো বোনকেই বিয়ে করা জায়েয, সেখানে মামাতো বোনের মেয়ের সম্পর্ক আরো দূরবর্তী (নিসা ৪/২৩; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমত' ১২/৫৩)।

প্রশ্ন (২৫/২৫) : আমি একটি ছাত্রাবাসে থাকি এবং পাশের একটি হানারী মসজিদে ছালাত আদায় করি। মাঝে মাঝে ফজরের ছালাত ওয়াক্তের শেষ দিকে আদায় করতে গেলে কয়েকজন তাবলীগের ভাই ছালাতরত অবস্থায় এসে বলেন, ছালাতের নিয়ত ছেড়ে দিন, এখন আর ছালাত হবে না। তাদের এ কথা এবং এভাবে ছালাত ছেড়ে দিতে বলা কি সঠিক?

-মোতাহার হোসাইন, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : এভাবে ছালাত ছেড়ে দিতে বলা সঠিক হয়নি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যদি সূর্য ওঠার আগে ফজরের ছালাতের একটি সিজদা পেয়ে যায়, তাহ'লে সে যেন তার ছালাত পূর্ণ করে' (বুখারী হা/৫৫৬; মিশকাত হা/৬০২)। ঘুমের কারণে বা ছালাতের কথা ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হবে তখনই ছালাত আদায় করবে। এক্ষেত্রে নিষিদ্ধ সময় ধর্তব্য নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন ছালাতের সময় ঘুমিয়ে থাকে অথবা তা ভুলে যায়, সে যখন স্মরণ করবে তখনই তা আদায় করবে' (বুখারী হা/৫৯৭; ছহীহাহ হা/৩৯৬)। এর ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ বলেন, 'যদি কোন মুসলিমের ঘুম বা ভুলে যাওয়ার মতো ওয়র থাকে এবং সে ওয়াক্তের মধ্যে ছালাত আদায় করতে না পারে, তাহ'লে ওয়র দূর হওয়ার পর তাকে ছালাত কাযা করতে হবে, যদিও তা নিষিদ্ধ সময়ের মধ্যে হয়' (ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৮০, ৫১৫)।

প্রশ্ন (২৬/২৬) : আমি একটি মুদি দোকান করি। আমার এলাকায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকজন বসবাস করে এবং তারা অনেক সময় মোমবাতি, আগরবাতি ও বাতাসা কিনতে চায়। শুনেছি এগুলো তারা পূজার কাজে ব্যবহার করে থাকে। তাদের নিকট এসব পণ্য বিক্রি করা হালাল হবে কি?

-শাকিল আহমেদ, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল।

উত্তর : সাধারণভাবে যেকোন হালাল ও বৈধ পণ্য হিন্দুদের কাছে বিক্রি করা যাবে। শুধু তারা অমুসলিম এ কারণে তাদের সঙ্গে বৈধ বেচাকেনা নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু যদি বিক্রেতা জানেন যে নির্দিষ্ট পণ্যটি তারা পূজার কাজে ব্যবহার করবে অথবা পরিস্থিতি এমন যে তা পূজায় ব্যবহারের প্রবল ধারণা হয়, তাহ'লে সেই নির্দিষ্ট ব্যবহারে সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাকুওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর; আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর না' (মায়দাহ ৫/২)। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'মুসলিমরা যদি অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবের জন্য এমন খাদ্য, পোশাক, সুগন্ধি ইত্যাদি বিক্রি বা উপহার দেয়, যা দ্বারা তারা তাদের হারাম উৎসব পালন করতে সহযোগিতা পায়, তাহ'লে এতে তাদের হারাম উৎসব প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করা হবে (ইকতিয়াউছ ছিরাতিল মুত্তাকীম ২/১৫)। তিনি আরও বলেন, যে উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মীয় উৎসব পালনে সহযোগিতা হয়, সে উদ্দেশ্যে এমন পণ্য বিক্রি করা বৈধ নয় (মাজমু'উল ফাতাওয়া ২৫/৩২৯)।

প্রশ্ন (২৭/২৭) : আমি পাইলসের রোগী হওয়ায় পায়খানার রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝেই রক্ত বের হয়। এতে আমার ছিয়াম

ভেঙ্গে যাবে কি?

-তসলীমা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। কারণ রক্ত বের হওয়া ছিয়াম ভঙ্গের কোন কারণ নয়। আর রাসূল (ছাঃ) ছিয়ামরত অবস্থায় তাঁর দেহে শিঙ্গা লাগিয়েছেন (বুখারী হা/১৯৩৮; মিশকাত হা/২০০২)।

প্রশ্ন (২৮/২৮) : মহিলারা সর্বোচ্চ কত বছর বয়সের বালকের সাথে বিনা পর্দায় দেখা করতে পারবে?

মাইসারা, আন্দারকিল্লা, চট্টগ্রাম।

উত্তর : নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ নাবালকদের সাথে মহিলারা বিনা পর্দায় সাক্ষাৎ করতে পারে (নূর ২৪/৩১)। আবহাওয়াগত ভিন্নতার কারণে সাবালক হওয়ার বয়সে ভিন্নতা দেখা দেয়। অতএব শিশুর মধ্যে সাবালক হওয়ার আলামত পাওয়া গেলে তার থেকে পর্দা করতে হবে।

প্রশ্ন (২৯/২৯) : যুবক অবস্থায় চুল বা দাড়ি পেকে গেলে সেই পাকা চুল বা দাড়ি তুলে ফেলা যাবে কি?

-ওমর ফারুক *রুবেল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

*শুধু ওমর ফারুক নাম রাখুন। (স.স.)

উত্তর : যুবক অবস্থায় মাথার চুল বা দাড়ি পেকে গেলেও তা উপড়ে ফেলা যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) পাকা চুল উপড়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) পাকা চুল উপড়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই এটি মুসলিমের জন্য নূর’ (তিরমিযী হা/২৮২১; হযীহুল জামে’ হা/৬৯৮১)। তিনি আরো বলেন, ‘তোমরা পাকা চুল উপড়ে ফেলো না। কোন মুসলিম ইসলামের অবস্থায় একটি চুল পাকালে কিয়ামতের দিন সেটি তার জন্য নূর হবে’ (আবুদাউদ হা/৪২০২; হযীহুল তারগীব হা/২০৯১)। অতএব, বয়স কম হ’লেও মাথার চুল বা দাড়ি পেকে গেলে তা উপড়ে ফেলা উচিত নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ও নিদর্শনকে রেখে দেওয়া সুন্নাত। হাদীছে পাকা চুল উপড়ে না ফেলার জন্য নেকীর সুসংবাদও এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোন পাকা চুল উপড়ে ফেলবে না, আল্লাহ তার জন্য এর বিনিময়ে একটি নেকী লিখবেন এবং এর দ্বারা তার একটি গোনাহ মুছে দেবেন’ (আবুদাউদ হা/৪২০২)।

প্রশ্ন (৩০/৩০) : সেনাবাহিনীর ট্রেনিংয়ের সময় ট্রেনিং এর অংশ হিসাবে সাপ, ব্যাঙ, শিয়ালের গোশত রান্না করে খেতে হয়। এসময় এগুলো খাওয়া জায়েয হবে কি?

-মিনহায পারভেজ, রাজশাহী।

উত্তর : সাপ, ব্যাঙ ও শিয়ালের গোশত সাধারণ অবস্থায় খাওয়া হারাম। তাই শুধু সামরিক প্রশিক্ষণের অংশ হওয়ায় এগুলো খাওয়া জায়েয হওয়ার জন্য উপযুক্ত কারণ নয়। একজন চিকিৎসক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এমন একটি ব্যাঙ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যেটি তিনি ঔষধে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাকে ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করলেন (আবুদাউদ হা/৩৮৭১; মিশকাত হা/৪৫৪৫, সনদ হযীহ)। অন্যদিকে সাপ ও শিয়াল হিংস প্রাণী হওয়ায় তা খাওয়া নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘দাঁত দিয়ে

শিকারকারী প্রত্যেক হিংস প্রাণীর মাংস খাওয়া হারাম’ (বুখারী হা/৫৫৩০; মুসলিম হা/১৯৩২; মিশকাত হা/৪১০৫)।

প্রশ্ন (৩১/৩১) : ব্যাংকে কর্মরত ব্যক্তি দানের অর্থে মসজিদের ছাদ করা হয়েছে। অথচ তাদের উপার্জন হালাল নয়। এক্ষেত্রে উক্ত মসজিদে ছাদে আদায় করা যাবে কি?

-মোয়াম্মেল হক, বগুড়া।

উত্তর : এরূপ মসজিদে ছাদে আদায়ে কোন বাধা নেই। কেননা একজনের পাপের বোঝা অন্য বহন করবে না’ (নাজম ৩৮)। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) কাফেরদের হাদিয়া গ্রহণ করেছেন (বুখারী হা/২৬১৫-২৬১৮)।

প্রশ্ন (৩২/৩২) : হিন্দু ব্যক্তি মারা গেলে তার মৃত্যুর খবর শুনে ইন্নালিল্লাহ... পাঠ করা ও তার লাশ দেখতে যাওয়া যাবে কি?

-সেলিম রেয়া, রাজশাহী।

উত্তর : কোন হিন্দু মারা গেলে তার মৃত্যুসংবাদ শুনে ইন্নালিল্লাহ... إِنَّا لِلّٰهِ وَإِإَّيْهِ رَاجِعُونَ (আমরা আল্লাহর জন্যই এবং আমরা তার নিকটই প্রত্যাবর্তনকারী) বলা জায়েয। মানবিক সমবেদনা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তার লাশ দেখতে যাওয়াও জায়েয। তবে তার জন্য মাগফিরাতের দো‘আ করা যাবে না এবং হিন্দুদের ধর্মীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা যাবে না। শায়েখ বিন বায বলেন, কোন কাফের মারা গেলে ইন্নালিল্লাহ...বলায় কোন দোষ নেই। কারণ সকল মানুষই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এবং সকল মানুষই আল্লাহর মালিকানাধীন। তবে তার জন্য মাগফিরাতের দো‘আ করা যাবে না (ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৪/৩৬৫)।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩) : নাভির নীচের ও বগলের লোম ৪০ দিনের মধ্যে না কাটলে গোনাহ হবে কি? ৪০ দিনের বেশী হয়ে গেলে ছালাত কবুল হবে না কথটি সঠিক কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : ৪০ দিনের অধিক সময় বগলের লোম ও গুণ্ডঙ্গের লোম না কাটা সুন্নাতবিরোধী কাজ। আনাস (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গোঁফ কাটা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়ানো এবং গুণ্ডঙ্গের লোম পরিষ্কারের ক্ষেত্রে ৪০ দিনের বেশী সময় না রাখার নির্দেশ দিয়েছেন’ (মুসলিম হা/২৫৮; মিশকাত হা/৪২২)। তবে ৪০ দিনের সীমা অতিক্রম করা পরিচ্ছন্নতার সুন্নাত লঙ্ঘনের বিষয় হ’লেও এই কারণে ছালাত বাতিল হয়ে যায় না (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/১২৬; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯/২৫৪)।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪) : মসজিদের পাশে অবস্থিত আবাসিক মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা মসজিদে না গিয়ে মাদ্রাসায় জামা‘আতে ছালাত আদায় করলে তা কি জায়েয হবে?

-আবু মুসা, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে, যদি মসজিদটি নিকটবর্তী হয় এবং স্বাভাবিকভাবে মাইকের সাহায্য ছাড়া আযান শোনা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আযান শুনল, অতঃপর জামা‘আতে উপস্থিত হ’ল না, তার ছালাত

নেই, তবে কোন ওয়র থাকলে ভিন্ন কথা' (ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩: ছহীহুল জামে' হা/৬৩০০)। শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'তোমরা যদি মাইক্রোফোন ছাড়া স্বাভাবিক কণ্ঠে আযানের শব্দ শুনে পাও...তাহ'লে তোমাদের জন্য মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করা আবশ্যিক' (ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১১/১৩২-১৩২)। অতএব ছাত্রদের কর্তব্য হ'ল মসজিদে গমন করা। কারণ মসজিদে জামা'আতে ছালাতের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। যেমন মসজিদে যাতায়াতের প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে ছওয়াব, মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়ের যিকরসহ অন্যান্য ফযীলত। আল্লাহ বলেন, 'এগুলো এমন ঘর, যেগুলোকে সম্মুখত করার এবং সেখানে তাঁর নাম স্মরণ করার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন; সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়' (নূর ২৪/৩৬)। তবে ছোট শিশুদের জন্য রাস্তা যদি নিরাপদ না হয় বা মসজিদে জায়গা সংকুলান না হয় বা শিশুরা মসজিদে গিয়ে মুছাল্লীদের বিরক্ত করে, তাহ'লে তাদের নিয়ে মাদ্রাসার মুছাল্লীরা ছালাত আদায় করা যাবে।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫) : আমি একটি জুতার কারখানায় কাজ করি। জুতা তৈরির সময় যথাযথ চেষ্টা করা সত্ত্বেও অনেক সময় জুতা নষ্ট হয়ে যায়। এসব ক্ষতির কথা সবসময় মালিককে জানানো হয় না। এভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে মালামাল নষ্ট হ'লে ক্রিয়ামতের দিন কি এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে?

-বোখারী ছাবিদ, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও অনিচ্ছাকৃতভাবে জুতার ক্ষতি হ'লে কর্মচারীর ওপর ক্ষতিপূরণ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে ভুল কর, তাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই; তবে তোমাদের অন্তর যা ইচ্ছাকৃতভাবে করে, তা ভিন্ন' (আহযাব ৩৩/৫)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি এবং যে কাজে তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে তা ক্ষমা করেছেন' (ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩: ছহীহুল জামে' হা/১৭৩১)। অতএব যথাযথ সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার পরেও অনিচ্ছাকৃতভাবে মালামাল নষ্ট হ'লে কর্মচারীর কোন গোনাহ বা ক্ষতিপূরণের দায় নেই।

প্রশ্ন (৩৬/৩৬) : হাদীছে বর্ণিত নিষিদ্ধ সময়ে তাহিইয়াতুল মসজিদ ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুয্যাম্মেল হক, নলডাঙ্গা হাট, নাটোর।

উত্তর : নিষিদ্ধ সময়েও মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত তাহিয়াতুল মসজিদ ছালাত আদায় করা যাবে। কারণ তাহিয়াতুল মসজিদ যাতুল-আসবাব বা কারণযুক্ত নফল ছালাত। সাধারণ নিষিদ্ধ সময়ের নফলের মতো নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দুই রাক'আত ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত না বসে' (বুখারী ১১৬৭: মুসলিম হা/৭১৪)।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭) : পিতা-মাতা আমার কল্যাণের জন্য মাযারে হাগল মানত করেছেন। কিন্তু আমি এতে বিশ্বাস করি না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-রামাযান শেখ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : প্রশ্ন অনুযায়ী এজন্য পিতা-মাতা গুনাহগার হবেন, সন্তান নয়। এক্ষণে সন্তানের জন্য কর্তব্য হবে পিতা-মাতাকে উক্ত শিরকী কাজ থেকে ফেরানোর জন্য প্রতিনিয়ত নছীহত করা।

প্রশ্ন (৩৮/৩৮) : হজ্জব্রত পালনকালে মহিলারা গহনা ব্যবহার করতে পারবে কি?

-আসমা, নোয়াখালী।

উত্তর : হজ্জ পালনকালে মহিলাদের গহনা ব্যবহারে কোন বাধা নেই। তবে এ সময় যেন তা পরপুরুষেরা দেখতে না পায় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ অলংকার নারী সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত (উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/২০১)।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯) : এনবিআরের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী অফিস চলাকালীন দাফতরিক দায়িত্বের বাইরে করদাতার আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার কাজ করে ১,০০০ টাকা পারিশ্রমিক গ্রহণ করার মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করা জায়েয হবে কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : কর্তৃপক্ষের অনুমতি না থাকলে তা হারাম হবে। কারণ চাকরীর নির্ধারিত সময় ও দায়িত্ব কর্মচারীর কাছে আমানত। সে সময়ের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠান তাকে বেতন প্রদান করে। অতএব সেই সময়ে ব্যক্তিগত উপার্জনের কাজে নিয়োজিত হওয়া চাকরীর চুক্তি ও আমানতের খেলাফ। কাজেই করদাতার সঙ্গে তার সরকারী দায়িত্বের সম্পর্কে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে তা ঘুষ বা অবৈধ সুবিধার পর্যায়ে চলে যায়। সরকারী কর্মচারীকে তার দায়িত্বের কারণে প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে ইসলামী শরী'আত কঠোর নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ করেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমরা যাকে কোন কাজে নিয়োগ করি এবং তাকে তার জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক প্রদান করি, এরপর সে অতিরিক্ত যা গ্রহণ করে, তা খেয়ানত বা ঘুষ (আবুদাউদ হা/২৯৪৩: মিশকাত হা/৩৭৪৮, সনদ ছহীহ)।

প্রশ্ন (৪০/৪০) : প্রাপ্তবয়স্ক চাচাতো, মামাতো বা ফুফাতো ভাই একজন কন্যাশিশুকে কত বছর পর্যন্ত কোলে নিয়ে আদর করতে বা চুমু খেতে পারবে?

-নাজমুছ ছাকিব, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।

উত্তর : ছোট কন্যা শিশু যার মধ্যে যৌন আকর্ষণ নেই, তাকে স্নেহবশে কোলে নেওয়া ও চুম্বন করা জায়েয। তবে চুম্বনটি মুখে না হয়ে কপাল বা মাথায় হওয়া উত্তম। অনুরূপভাবে চুম্বনকারীর মধ্যেও কামভাব থাকা যাবে না। কামভাব নিয়ে ছোট শিশুকে চুম্বন দিলেও গোনাহ হবে। শরী'আতে ৫, ৬ বা ৭ বছর এমন সার্বজনীন নির্দিষ্ট বয়সসীমা নির্ধারিত নেই। বয়সের পাশাপাশি শিশুর শারীরিক গঠন, বোধশক্তি ও আকর্ষণীয়তার বিষয়টিও বিবেচ্য। বিশেষ করে চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো ভাই যেহেতু গায়ের মাহরাম, তাই মেয়েটি এমন বয়সে পৌঁছালে যখন তার প্রতি স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণের সম্ভাবনা তৈরি হয়, তখন কোলে নেওয়া, জড়িয়ে ধরা ও চুম্বন করা থেকে বিরত থাকতে হবে (ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৯/২; বিন বায, ফাতাওয়ালা মারা'তিল মুসলিমা ৩/৭৮-৮৯, ৭/৮৪৫)।

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ (রুখারী হা/১৯৫৪)। ‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’ (আব্দুউদ হা/৪২৬)।

সাহারী ও ইফতারসহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : অক্টোবর ২০২৬ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ অক্টোবর	১৮ রবীঃ আখের	১৬ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৩৬	০৫:৫১	১১:৪৯	০৩:১৩	০৫:৪৬	০৭:০১
০৩ অক্টোবর	২০ রবীঃ আখের	১৮ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৩৭	০৫:৫১	১১:৪৮	০৩:১১	০৫:৪৪	০৬:৫৯
০৫ অক্টোবর	২২ রবীঃ আখের	২০ আশ্বিন	সোমবার	০৪:৩৭	০৫:৫২	১১:৪৭	০৩:১০	০৫:৪২	০৬:৫৭
০৭ অক্টোবর	২৪ রবীঃ আখের	২২ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৩৮	০৫:৫৩	১১:৪৭	০৩:০৯	০৫:৪০	০৬:৫৫
০৯ অক্টোবর	২৬ রবীঃ আখের	২৪ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৩৯	০৫:৫৪	১১:৪৬	০৩:০৮	০৫:৩৮	০৬:৫৪
১১ অক্টোবর	২৮ রবীঃ আখের	২৬ আশ্বিন	রবিবার	০৪:৪০	০৫:৫৫	১১:৪৬	০৩:০৭	০৫:৩৬	০৬:৫২
১৩ অক্টোবর	০১ জুম্মাঃ উলাঃ	২৮ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৪০	০৫:৫৬	১১:৪৫	০৩:০৬	০৫:৩৪	০৬:৫০
১৫ অক্টোবর	০৩ জুম্মাঃ উলাঃ	৩০ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৪১	০৫:৫৭	১১:৪৫	০৩:০৪	০৫:৩২	০৬:৪৮
১৭ অক্টোবর	০৫ জুম্মাঃ উলাঃ	০১ কার্তিক	শনিবার	০৪:৪২	০৫:৫৮	১১:৪৪	০৩:০৩	০৫:৩১	০৬:৪৭
১৯ অক্টোবর	০৭ জুম্মাঃ উলাঃ	০৩ কার্তিক	সোমবার	০৪:৪৩	০৫:৫৮	১১:৪৪	০৩:০২	০৫:২৯	০৬:৪৫
২১ অক্টোবর	০৯ জুম্মাঃ উলাঃ	০৫ কার্তিক	বুধবার	০৪:৪৩	০৫:৫৯	১১:৪৪	০৩:০১	০৫:২৭	০৬:৪৪
২৩ অক্টোবর	১১ জুম্মাঃ উলাঃ	০৭ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৪৪	০৬:০০	১১:৪৩	০৩:০০	০৫:২৬	০৬:৪২
২৫ অক্টোবর	১৩ জুম্মাঃ উলাঃ	০৯ কার্তিক	রবিবার	০৪:৪৫	০৬:০১	১১:৪৩	০২:৫৯	০৫:২৪	০৬:৪১
২৭ অক্টোবর	১৫ জুম্মাঃ উলাঃ	১১ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৪৬	০৬:০২	১১:৪৩	০২:৫৮	০৫:২৩	০৬:৪০
২৯ অক্টোবর	১৭ জুম্মাঃ উলাঃ	১৩ কার্তিক	বৃহস্পতি	০৪:৪৭	০৬:০৩	১১:৪৩	০২:৫৭	০৫:২১	০৬:৩৮
৩১ অক্টোবর	১৯ জুম্মাঃ উলাঃ	১৫ কার্তিক	শনিবার	০৪:৪৮	০৬:০৫	১১:৪৩	০২:৫৬	০৫:২০	০৬:৩৭

মেলা ভিত্তিক সময়সূচী ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ					
বেলায় নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-২	-১	-১	-১
গাথীপুর	+০	+০	+১	০	+১
শরীয়তপুর	০	০	+১	+১	+১
নারায়ণগঞ্জ	-১	-২	-১	০	-১
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+২	+২
কিশোরগঞ্জ	+৬	+৫	+৫	+৫	+৬
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	০	+১	০
রাজবাড়ী	+৪	+৩	+৪	+৫	+৪
মাদারীপুর	+১	+১	+১	+২	+১
গোপালগঞ্জ	+২	+২	+৩	+৩	+২
ফরিদপুর	+৩	+২	+৩	+৩	+৩

খুলনা বিভাগ					
বেলায় নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৫	+৪	+৫	+৬	+৫
সাতক্ষীরা	+৫	+৫	+৬	+৬	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৮	+৭
নড়াইল	+৩	+৩	+৪	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৭	+৭	+৭
কুষ্টিয়া	+৪	+৩	+৪	+৫	+৪
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৩	+৩	+৪	+৫	+৪
বাগেরহাট	+২	+২	+৩	+৩	+২
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫

রাজশাহী বিভাগ					
বেলায় নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+৩	+৩	+৩
পাবনা	+৮	+৭	+৭	+৭	+৭
বগুড়া	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নাটোর	+৫	+৫	+৫	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৫	+৫	+৫	+৬	+৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৮	+৯	+৮	+৯
নওগো	+৭	+৬	+৬	+৬	+৭

চট্টগ্রাম বিভাগ					
বেলায় নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩	-২	-৩
ফেনী	-৪	-৪	-৩	-৩	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৭	-৭	-৬	-৬	-৭
নোয়াখালী	-৩	-৩	-২	-২	-২
চাঁদপুর	-২	-২	-১	০	-১
লক্ষ্মীপুর	-২	-২	-১	০	-১
চট্টগ্রাম	-৬	-৬	-৫	-৪	-৫
কক্সবাজার	-৭	-৭	-৫	-৪	-৬
খাগড়াছড়ি	-৮	-৮	-৭	-৬	-৭
বান্দরবান	-৮	-৮	-৭	-৬	-৭

ময়মনসিংহ বিভাগ (www.bmd.gov.bd), ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বইসমূহ



০১৭৭০-৮০০৯০০ | hadeethfoundationbd.com



বাংলাদেশ আই হাসপিটাল রাজশাহী লিমিটেড

চোখের যত্নে
বিশ্বস্ত ঠিকানা

বাংলাদেশের স্বনামধন্য চক্ষু হাসপাতাল 'বাংলাদেশ আই হাসপিটাল'-এর নতুন শাখা এখন রাজশাহীতে

এখানে সকাল ৮-টা থেকে রাত ৯-টা পর্যন্ত প্রতিদিন নিয়মিত রোগী দেখছেন প্রায় ২৫-৩০ জন অভিজ্ঞ ও দক্ষ চক্ষু বিশেষজ্ঞ। চোখের সকল জটিল ও সাধারণ সমস্যার জন্য এখানে রয়েছে সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ চক্ষু চিকিৎসা সেবা।

সেবাসমূহ

ছানি (ফ্যাকো) অপারেশন, গ্লুকোমা চিকিৎসা, রেটিনা ও ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি, কর্নিয়া ও চোখের সংক্রমণ, শিশুদের চোখের রোগ ও স্কুইন্ট (ট্যারা), অকুলোপ্লাস্টিক (Oculoplastic) সেবা (চোখের পাতা, চোখের চারপাশ ও টিয়ার ডাক্ট), চশমা ও কনট্যাক্ট লেন্স এবং চোখের সকল আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিত করতে আমাদের রয়েছে সর্বাধুনিক মেশিনারিজ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব পরিবেশ এবং সশ্রয়ী খরচে মানসম্মত চিকিৎসা।

যোগাযোগ

আই টেন টাওয়ার, এয়ারপোর্ট রোড, আম চত্বর রাজশাহী
মোবাইল : ০৯৬৪৩১২৩১২৩



এম. এস. মানি চেঞ্জার
(M.S. MONEY CHANGER)

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

এখানে সকল প্রকার বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।
ডলার, পাউন্ড, ইউরো, সউদী রিয়াল, কুয়েতি দীনার, রিংগিট
ইত্যাদি এবং পাসপোর্টে ডলার এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

⑧ ঠিকানা: গনকপাড়া, মার্কেটহিল ব্যাংকের নিচে,
সাহেব বাজার জিরোপয়েন্ট, রাজশাহী।

⑨ ০১৭২৬-৮৬৮৬৬৬ (অফিস)
০১৭৫৪-১৪৮৪১২

⑩ টেলি: ০২৫৮৮৮৫৫৯০২

কুরআন-হাদীছের অনুবাদও অধিকাংশ ভাষায় পাওয়া যায়। ফলে অনারবদেরও তা বুঝতে মোটেও অসুবিধা পোহাতে হয় না। অন্যান্য বই যেমন কাফিয়াহ, শাফিয়াহ, মুতাওয়াল, কিফায়াহ, হেদায়াহ, কামুস, কাশশাফ ইত্যাদির অবস্থা একটু ভাবুন! গ্রন্থগুলোর পাঠ (Text) বা মূল লেখা এতই সূক্ষ্ম ও ইঙ্গিতপূর্ণ যে, কেবল একটি গ্রন্থের মর্ম পুরোপুরি উদ্ধার করতে একজন মানুষের পুরো জীবন কেটে যেতে পারে। বিষয়টি আলেমদের কাছে অজানা নয়। ক্বিয়ামতের দিন কিন্তু এই কুরআন ও হাদীছ সম্পর্কে মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে, অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে নয়। আমাদের বুঝতে হবে যে, অন্যান্য গ্রন্থ পড়া হয় নিষেধ অথবা উপকারশূন্য। মূল কথা হ'ল, প্রয়োজনীয় বিষয়কে অপ্রয়োজনীয় বিষয় থেকে এবং উত্তম বিষয়কে নিম্নতর বিষয় থেকে পৃথক করতে হবে। যে বিষয় অধিক প্রয়োজনীয় ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ, প্রথমে সেটিই গ্রহণ করতে হবে। এরপর সময়-সুযোগ অবশিষ্ট থাকলে যে গ্রন্থের প্রতি স্বভাবত আগ্রহ রয়েছে সে গ্রন্থ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করা যেতে পারে। কবি বলেন,

عمر قليل آمد و علمت كثير + آنچه ضروريست همان پیش گیر

‘জীবন যে হয় সংক্ষিপ্ত অতি, জ্ঞান যে অগাধ সিদ্ধ,

যা কিছু পাও আবশ্যিক, তা-ই তুলে নাও বিন্দু বিন্দু’।

ইলমুল আসানীদ বা সনদবিজ্ঞান হ'ল, হাদীছ বর্ণনাকারী রাবীদের পুরো অবস্থা যথাযথভাবে জানা এবং তাঁদের সংখ্যা কম না বেশী তা জানার বিদ্যা। কারণ হাদীছের শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা নির্ভর করে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা, তাঁদের দুর্বলতা ও যোগ্যতার ওপর। আর সনদ হ'ল এমন কোন নির্ভরযোগ্য উস্তাদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করা, যার সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পর্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছাকাছি সময়ে এ ধরনের সনদ অর্জন আমাদের যুগের তুলনায় অনেক সহজ ছিল। হেদায়াতের সেই প্রাথমিক যুগ আমাদের থেকে বহু দূরে চলে গেছে। আবার পূর্বযুগের আলেমগণ যেমন কুতুবে সিদ্দাহ প্রভৃতি গ্রন্থের সংকলকদের ফাঙ্কাহাত বা জ্ঞানগরিমা দিবালোকের মতো স্পষ্ট ছিল। তারা প্রতিটি হাদীছ সনদসহ তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। অতঃপর এখন মুতাওয়াজিরভাবে তাদের গ্রন্থ থেকে মানুষ হাদীছ বর্ণনা করে চলেছেন। ফলে বর্তমানে এসব গ্রন্থ পরিবর্তন বা বিকৃত করা অসম্ভব। তারা হাদীছ বর্ণনাকারী রাবীদের অবস্থা আসমাউর রিজাল শাস্ত্রে সংকলন করে গেছেন। এ ধরনের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সংকলিত ও সংরক্ষিত হওয়ার পর পৃথকভাবে সনদ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই দূর হয়ে গেছে। مَنْ حَرَّبَ الْمُحَرَّبَ حَلَّتْ بِهِ الدَّامَةُ ‘পরীক্ষিত জিনিস যে পরীক্ষা করে পরিণামে সে অনুশোচনা ভোগ করে’।

অতএব কোন ব্যক্তি যদি উদাহরণস্বরূপ ছহীহ বুখারী দেখেন, তাহ'লে মনে হবে যেন তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাদিল আল-বুখারী (রহ.)-এর কাছ থেকেই সনদ গ্রহণ করছেন। কারণ তিনি তাঁর গ্রন্থে নিজের সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। সুতরাং কেউ যখন ছহীহ

বুখারীতে কোন হাদীছ খুঁজে পেল, তখন যেন তিনি তা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখ থেকেই শুনল। অনুরূপভাবে মিশকাতুল মাছাবীহ-এর সংকলকও তাঁর ভূমিকার মধ্যে এ কথাই জানিয়েছেন যে, আমরা যখন আমাদের হাদীছসমূহকে নির্ভরযোগ্য ছহীহ গ্রন্থগুলোতে দেখতে পেয়েছি, তখন মনে হয়েছে যেন আমরা সেগুলো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছ থেকেই সনদের মাধ্যমে গ্রহণ করেছি। কারণ এসব গ্রন্থের সংকলকগণ আমাদের পৃথকভাবে সনদ গ্রহণের প্রয়োজন থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে আরও বহু মুহাদ্দিছ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যে, বর্তমান যুগে সনদ মূলত একটি প্রচলিত রীতি হিসাবেই অবশিষ্ট রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণকে তার রহমতের বারিধারায় সিক্ত করুন! তাঁরা জাল ও নির্ভেজাল হাদীছকে পৃথক করেছেন, ছহীহ ও দুর্বল হাদীছকে আলাদা করেছেন এবং হাদীছের বিভিন্ন স্তর ও মর্যাদা অনুযায়ী সেগুলো তাঁদের গ্রন্থসমূহে সংকলন করেছেন। তাঁরা প্রতিটি বিষয়কে আলাদা আলাদা অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন। হাদীছের গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, হাদীছসমূহের মধ্যে খবরিয়াত (خبريات) বা সংবাদমূলক (আক্বীদাহ, ইতিহাস অথবা পরকালীন সংবাদ সংক্রান্ত) মাসআলাও অগণিত রয়েছে। বর্তমানে হাদীছশাস্ত্র অধ্যয়ন করাও ফিক্বহের গ্রন্থসমূহের মত অনেক সহজবোধ্য হয়ে গেছে। কোন একটি মাসআলা সামনে এলে, সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে তা অনুসন্ধান করলেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশনা পাওয়া যাবে। বরং কোন কোন দিক থেকে ফিক্বহের চেয়েও হাদীছ বুঝা সহজ। কারণ ফিক্বহের কিতাব অগণিত এবং আলেমগণ সেগুলোতে পরস্পরবিরোধী মত দিয়েছেন। যদি এক গ্রন্থে কোন মাসআলা জায়েয লেখা থাকে তবে প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে যে, অন্য গ্রন্থে তা নাজায়েয লেখা থাকবে। আবার কোন মত অনুযায়ী আমল করা হবে সেটাও লেখা নেই।

কোথা থেকেই বা এতসব গ্রন্থ এক জায়গায় করা যাবে? আর সেসব গ্রন্থে খুঁজে খুঁজে আল্লাহর বিধান বের করার এত সময়ই বা কোথায়? শ্রুত ও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হাদীছ অসংখ্য হ'লেও বহুলাংশে তা জাল বা মওযু। মুহাদ্দিছগণ তাদের মুসনাদ গ্রন্থাবলীতে যেসব হাদীছ সংকলন করেছেন তার সংখ্যা সীমিত ও গণনাকৃত। তারা তাদের গ্রন্থে ছহীহ হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলন করে তার সংখ্যা বলে দিয়েছেন। এ বিষয়টি জ্ঞানীদের নিকট অজানা নয়। হাদীছের গ্রন্থগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাসেখ (রহিতকারী) ও মানসূখ (রহিত) হাদীছ এক পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে, ফলে অনুসন্ধানকারীদের তা নিয়ে পেরেশান হ'তে হয় না।

হাদীছটি রহিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এমন আশঙ্কায় কোন হাদীছের উপর আমল পরিত্যাগ ঠিক হবে না। কেননা রহিত হওয়ার এ সম্ভাবনা তো সকল হাদীছের বেলায় প্রযোজ্য। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের সকল কথা সংগৃহীত হয়নি। বরং অনেক কথাই হাতছাড়া হয়ে গেছে। আর এমন হ'লে তো কোন মুজতাহিদের জন্যই একটা হাদীছের উপরও আমল সমীচীন হবে না।

[বাকী অংশ ৪৩ পৃষ্ঠা দ্রা]

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

এক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নাসেখ হাদীছ কারো কাছে না পৌঁছে ততক্ষণ পর্যন্ত মানসূখ হাদীছ তার ক্ষেত্রে মানসূখ গণ্য হবে না যদিও বাস্তবে তা মানসূখ। যখন নাসেখ হাদীছ পৌঁছাবে তখন মানসূখ হাদীছের উপর আমল আদৌ জায়েয হবে না। রাবী‘আ (বাহরাইন) গোত্রের জন্য حَسْمٌ (হানতাম বা সবুজ কলস) ও دُبُّعٌ (দুবুউ বা লাউয়ের খোলার পাত্র) ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা ততদিন পর্যন্ত মানসূখ হয়নি যতদিন পর্যন্ত না নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার নাসেখ হাদীছ তাদের হাতে পৌঁছেছে। অতএব সূন্নাহের অনুগামী কর্তব্য হবে জীবনভর যদি তার হাতে একটি হাদীছও হস্তগত হয় এবং আর কোন হাদীছের দেখা না মেলে তবুও সে সেই একটি হাদীছকে মহামূল্যবান মনে করে ঝাঁকড়ে ধরে রাখবে। রাসূল (ছঃ) বলেছেন، لَوْ أَنِّي وَ لَوْ أَنِّي (‘একটা আয়াত হ’লেও আমার পক্ষ থেকে তা পৌঁছে দাও’)—এর মর্ম এটাই। কিতাবসমূহ অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, পূর্ববর্তী আলেমগণও নাসেখ হাদীছ হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত মানসূখ হাদীছের উপর আমল করতেন।

পরস্পর বিরোধার্থক হাদীছ সমূহও (أَحَادِيثُ مُعَارَضَةٌ) হাদীছ গ্রন্থে এক জায়গায় লেখা হয়ে থাকে, যাতে একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই বিরোধ দূর হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছঃ)—এর কথার মধ্যে দৃশ্যত কোন বিরোধ থাকার কথা নয়। কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের চোখে তা বিরোধপূর্ণ মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি হাদীছের অর্থ ও প্রয়োগের ক্ষেত্র ভিন্ন হয়ে থাকে। হাদীছের প্রকারভেদ সম্পর্কে একটি কথা বাকী রয়েছে। তা এই যে, ‘উছূলে হাদীছ’ বা হাদীছের মূলনীতি শাস্ত্রের আলেমগণ হাদীছের অনেক প্রকার বর্ণনা করেছেন। যেমন ছহীহ, হাসান, আহসান, গরীব, মুরসাল, মারফূ, মওকূফ, মাকতূ ইত্যাদি। হাদীছের এত সব মাত্রা বা স্তর প্রত্যেকের মস্তিষ্ক দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে না। ফলে হাদীছের উপর আমল থমকে যেতে পারে। আমাদের বুঝতে হবে যে, হাদীছের প্রকারভেদগুলোর এই আধিক্য মূলত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও শর্তের পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে। যত বেশী শর্ত ও দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করা হবে, প্রকারের সংখ্যা তত বাড়তেই থাকবে; আর যত শর্ত কমানো হবে, প্রকারের সংখ্যাও তত কমে আসবে। যেমন মানুষ দুই প্রকার হ’তে পারে, যথা: শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়। আবার হাযার প্রকারও হ’তে পারে। যথা: সাদা, কালো, লাল, বাদামী, পিঙ্গল, লম্বা গলা, খাটো গলা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু হাদীছের ক্ষেত্রে প্রকারভেদ অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার কারণে সাধারণ আমলকারীদের মধ্যে প্রচুর দ্বিধাবোধ বা সন্দেহ সৃষ্টি হয়।

উছূলে হাদীছ শাস্ত্রের আলেমগণ হাদীছের প্রকার নির্ণয়ে চমৎকার ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন। হাদীছের ওপর আমলকারীরাও যদি নিজেদের সামনে একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি রাখেন, তাহ’লে তাতে অনেক উপকার হবে। সেই সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিটি হ’ল, মওযু‘ (জাল) নয় এমন সব হাদীছ মূলত দুই প্রকার: শক্তিশালী (قوي) ও দুর্বল (ضعيف)। শক্তিশালী সেই হাদীছকে বলে যার বর্ণনাকারীগণ অজ্ঞাত নন

এবং তাদের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত। আর দুর্বল সেই হাদীছকে বলে যার বর্ণনাকারীদের সনদ অজ্ঞাত নয়; কিন্তু সেই বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা (ثقات) এবং অন্যান্য অবস্থা যথাযথভাবে প্রমাণিত নয়। সবল হাদীছকে তারা আবার দুই প্রকার বলে থাকেন। কোন হাদীছ বা তার বিষয়বস্তু রাসূলুল্লাহ (ছঃ) থেকে একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করলে সেটি মুতাওয়াতির। আর যদি এমন না হয় তাহ’লে সেটি গায়রে মুতাওয়াতির। অন্যান্য কিতাবে ওলামায়ে কেরাম মুতাওয়াতির হাদীছের বর্ণনাকারীর নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করেননি। এর কারণ হ’ল, রাবীদের অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে তাওয়াত্বের জন্য নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই। যখন কোন বর্ণনা সামগ্রিকভাবে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিয়ে দেয়, তখনই সেটি মুতাওয়াতির হিসাবে গণ্য হয়। তবে এ কথা অস্পষ্ট নয় যে, যখন রাবীগণ বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হন, তখন তাঁদের তিনজনের বর্ণনাও নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে। এ কারণে এখানে তা তিনজন রাবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

মুতাওয়াতির হাদীছ অকাটা দলীল (نَصٌّ قَطْعِي)। অমুতাওয়াতির হাদীছ প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সত্য বলে বিবেচিত (مظنون الصدق بظن غالب)। আর দুর্বল হাদীছ সত্য ও মিথ্যা উভয়েরই সম্ভাবনায়ুক্ত। দুর্বল হাদীছ ক্রিয়ামত, বারযাখ, জাহান্নাম, জান্নাত, ভয় প্রদর্শন, উৎসাহ প্রদান এবং এ ধরনের বিষয়সমূহে গ্রহণ করা হবে। আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রেও হদ, কিছুছাড়া ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া, যদি এর বিপরীতে কোন শক্তিশালী হাদীছ না থাকে; তাহ’লে তার ওপর আমল করা হবে। আর যদি শক্তিশালী হাদীছ এর বিরোধী হয়, তাহ’লে তা (যদিগ্ন হাদীছ) পরিত্যাগ করতে হবে। এছাড়াও যদি পরবর্তীতে একই বিষয়বস্তুর তিনটি দুর্বল হাদীছ পাওয়া যায়, তাহ’লে সেগুলো শক্তিশালী হাদীছের বিধান লাভ করবে।^৩ মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা অমুতাওয়াতির হাদীছকে রহিত করা জায়েয। শক্তিশালী অমুতাওয়াতির হাদীছের মাধ্যমে প্রমাণিত কোন বিধানের উপর আমল করা ফরয এবং তা অস্বীকারকারী কাফের। হাদীছের এই পরিমাণ প্রকারভেদ ও বিধান প্রত্যেক আমলকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী জানা যক্রুরী এবং যথেষ্ট।

৩. মাননীয় লেখকের এই বক্তব্যটি সঠিক নয়। কয়েকটি যদ্বিগ্ন হাদীছ একত্র হ’লেই তা ছহীহ হাদীছে পরিণত হয় না। উছূলে হাদীছ অনুযায়ী হাদীছের ছহীহ বা যদ্বিগ্ন হওয়া সনদ ও মতনের গ্রহণযোগ্যতার ওপর নির্ভর করে, যা কোন সংখ্যাগত বিষয় নয় (ইবনু হাজার, নুযহাতুন নাযার, পৃ. ৮০-৮৫; ইবনুছ ছালাহ, মুকাদ্দিমাহ ইবনুছ ছালাহ, পৃ. ৩৪-৩৬)। তবে সামান্য দুর্বলতাসম্পন্ন হাদীছ একাধিক স্বতন্ত্র সনদে বর্ণিত হ’লে তা ‘হাসান লিগায়রিহী’ (حسن لغيره) পর্যায়ে উন্নীত হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ‘কয়েকটি যদ্বিগ্ন হাদীছ মিলে একটি ছহীহ হাদীছ হয়ে গেল’। বরং এটি হাসান লিগায়রিহী, যা পরিভাষাগতভাবে ছহীহ লিখাতিহির সমান নয় (ঐ)। পক্ষান্তরে বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী বা অতি দুর্বল হ’লে একাধিক সনদ থাকলেও তা শক্তিশালী হয় না (সাখাবী, ফাতহুল মুগীছ, ১/৬৮-৭০)। অতএব অকীদা ও হালাল-হারামসহ শরী‘আতের কোন বিধানেই যদ্বিগ্ন হাদীছ একক দলীল হ’তে পারে না; বরং মূল বিধান কুরআন বা ছহীহ হাদীছে প্রমাণিত থাকলে একে কেবল সহায়ক প্রমাণ (শাহিদ ও মুতাবা‘আত) হিসাবে উল্লেখ করা যায় (ইমাম মুসলিম, মুকাদ্দিমাহ ছহীহ মুসলিম, ১/৭; ইবনু তাযমিয়াহ, মাজমু‘উল ফাতাওয়া, ১/২৫০; শাতিবী, আল-ইতিহাম, ১/২৪০) -অনুবাদক।